আনন্দমেলা
১৬ নভেম্বর ১৯৮৭
২·৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন
এই সংখ্যায় অশেষ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস দুর্ঘটনার পর

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি দিয়েছেন - শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, সোমনাথ দাসগুপ্ত

স্ক্যান করেছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

"বালী বালী, শস্তা
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে..."

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণুগুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

আমেলা

বিশেষ রচনা
হাউ মাউ চাউ ৫
শ্রীসুকুমার সেন

সম্পূর্ণ উপন্যাস
দুর্ঘটনার পর··· ৫০
অশেষ চট্টোপাধ্যায়

কবিতা ও ছড়া
কোলাঘাটে রবিবার ২৫
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
রাম-লক্ষ্মণ ৩০
সাধনা মুখোপাধ্যায়
গোয়েন্দা বাবুই ৪৯
রঞ্জন ভাদুড়ী

গল্প
টুটুর গোয়েন্দাগিরি ১১
সজল দাশগুপ্ত
বিভীষণবাবুর ভীষণ মেজাজ ২৬
সুনীল জানা
জার্মানির ভুতুড়ে প্রাসাদে ৩৮
মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়
দূরের গন্ধ ৪৪
শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণকাহিনী
মানস-কৈলাস ৬
শ্যামসুন্দর বসু

ধারাবাহিক উপন্যাস
নোটোর দল ১৯
লীলা মজুমদার

স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে ৩১
পঙ্কজ রায়

কিশোর ক্লাসিক
২০,০০০ লিগ্‌স আণ্ডার দ্য সি ৭৬
ভাষান্তর : শেখর বসু
খেলাধুলো, কমিক্‌স, বিজ্ঞানবিচিত্রা
ধাঁধা, শব্দসন্ধান ইত্যাদি

প্রচ্ছদ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

কার্তিক গেল ফুরিয়ে, এবং
এসে গেল অঘ্রান,
চুরি করে নিয়ে রৌদ্রের রং
পেকেছে সোনার ধান।
আকাশের চোখ করে ছলছল,
বাতাস গিয়েছে ঘুরে ;
শীত আসে, তাই কাঁথা-কম্বল
শুকোচ্ছে রোদ্দুরে।

৩০ কার্তিক ১৩৯০ ১৬ নভেম্বর ১৯৮৩ ৯ বর্ষ ১৬ সংখ্যা

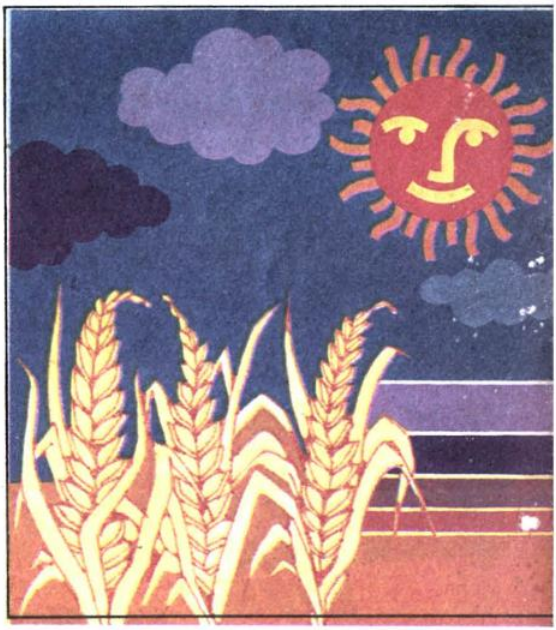

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাল্মাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্য...
লাইফবয় পার্সোনাল
নতুন লাইফবয় পার্সোনাল সেই চির পুরাতন লাইফবয়ের মতই ধুলোময়লার বীজাণু দূর করে...এর সুপ্রচুর ফেনা ও মনমাতানো সুগন্ধ আপনাকে এনে দেয় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতি। তেমনি আকর্ষণীয় এর গড়ন ও মোড়ক। লাইফবয় পার্সোনাল দিয়েই স্নান করুন... আধুনিক যুগের আধুনিক সাবান!
Lifebuoy
Personal Soap
Lifebuoy
লাইফবয় পার্সোনাল
স্নানে আনে এক অপূর্ব তৃপ্তি
হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিনটাস-LP.10-1812 BG

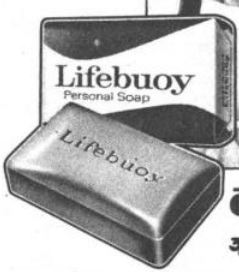

এক যে আছে দ্বীপ

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে হল এখনও ঘুমিয়ে আছি। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি। ভোরবেলার কুয়াশা পর্দার মতো আস্তে আস্তে সরে গিয়ে চোখের সামনে পাহাড়ের গায়ে এমন একটা ছবি ফুটে উঠছে, যা দেখে সত্যি বলে বিশ্বাসই হয় না।

আমাদের ছোট্ট জাহাজটা ঐ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি জাহাজের দোতলায়, হু-হু বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ডেকের ওপর। সেখান থেকে মনে হচ্ছে, পাহাড়টার ঠিক নীচে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে বুঝি জাহাজ-জাহাজ খেলতে-খেলতে হঠাৎ কোথায় চলে গেছে। একসারি খেলনা-জাহাজ বাঁধা রয়েছে শান্ত নীল জলের ওপর। আমাদের জাহাজ নাকি ঐ বন্দরেই গিয়ে ভিড়বে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওটা একটা পুতুল-বন্দর, সকালবেলার টাটকা বাতাসে তকতকে করে সাজানো।

আরও একদল ছেলেমেয়ে ঐ বন্দরের ওপর পাহাড়টার গায়ে নিশ্চয় বাড়ি-বাড়ি খেলছিল। এখন তারাও সব কোথায় চলে গেছে। দেখেশুনে মনে হল, এ-খেলাটা জাহাজ-জাহাজ খেলার চেয়েও মজার। কারণ বাড়িগুলো দেখতে সব ঝকঝকে নতুন হলেও মনে হয় এগুলো সব দেড়শো-দুশো বছর আগে তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ, এ-খেলার যেন নিয়ম, নতুন মালমশলা দিয়ে পুরনো বাড়ি তৈরি করতে হবে। তোমার তৈরি বাড়িতে একালের ছোঁয়া লাগলেই তুমি আউট !

সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার ! সুতরাং, কার না মনে হবে স্বপ্ন দেখছি ? তবে সামনের বন্দরে জাহাজ ভিড়লে যে-দ্বীপের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব আমরা, সেটা যে আসলে আশ্চর্য ব্যাপারস্যাপার, রূপকথা আর রহস্যের খনি, তা তো জেনেশুনেই অ্যাডভেঞ্চার আর নতুন অভিজ্ঞতার লোভে কলকাতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে এসেছি। সুতরাং, জাহাজের ডেক থেকে দ্বীপটাকে দেখতে না-দেখতেই ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন ? এই তো সবে রহস্য আর রূপকথার শুরু। মনে মনে আরও বড় অবাককাণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিই।

এই আশ্চর্য, আজগুবি দ্বীপের কথা আমাকে কিন্তু আমাদের ভুগোলের 'স্যার' কোনওদিন বলেননি। আমাদের ইতিহাসের স্যারও এই দ্বীপের ইতিহাস শোনাননি আমাদের কোনওদিন। তাঁদের ওপর আমার এখন কেমন যেন রাগ-রাগ হচ্ছিল। আবার এই ভেবে দারুণ লাগছিল যে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রবিনসন ক্রুসোর মতো আমি এমন একটা

বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্যে এক মজাদার জুতো !
আমাদের কথা বিশ্বাস করুন!
ম্যাঁয়াও-ও-ও
Bubble gummers
বাবল্‌গামারস্‌—মজার সময়ে এক মজাদার জুতো। মজবুত আর্চ সাপোর্টে বিশেষভাবে তৈরি এই জুতো নির্ভাবনায় ধোওয়া যায় ; আর রঙ ?—একটুও চটে না।
যেমন এক নিরাপদ জুতো আপনি বরাবর আপনার বাচ্চার খেলার সময়ের জন্যে চেয়ে এসেছেন —এ একেবারে ঠিক তেমন।
Design 43
Design 08
Design 07
Design 05
Bata
understands shoes
অগ্রণী Bata ও BSC-র দোকানে পাওয়া যায়।

React-B-4/8

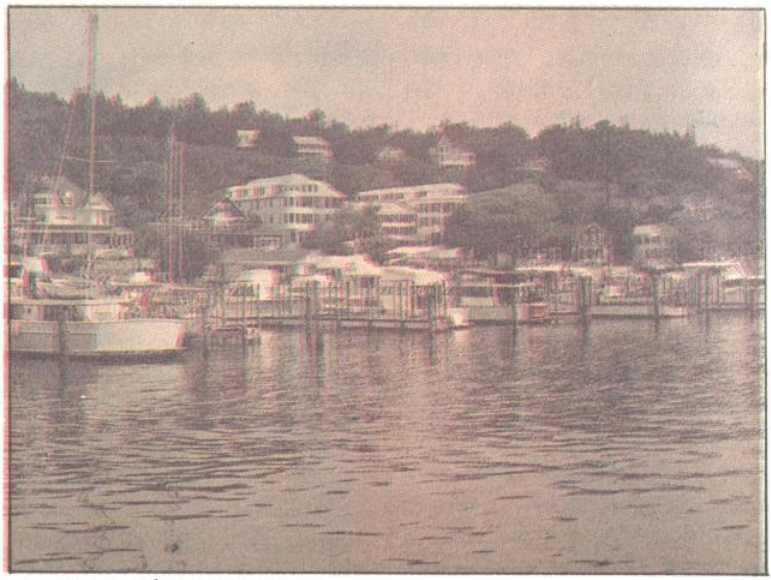

জাহাজ থেকে ম্যাকিন্যাক যেমন দেখায়

জায়গায় পৌঁছে যাব যার খোঁজ-খবর অন্তত ভূগোল বা ইতিহাসের বইতে বিশেষ পাওয়া যায় না। কোনও ভ্রমণকাহিনীতেও এই দ্বীপের কথা পড়েছি বলে মনে পড়ছে না।

দ্বীপের নাম ম্যাকিন্যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাপটা যদি চোখের সামনে রাখো, তবে দেখবে মিশিগানের একদম উত্তরে খানিকটা জলপথ পেরিয়ে একটা ছোট্ট বিন্দুর মতো রয়েছে। ওটাই হচ্ছে ম্যাকিন্যাক আইল্যাণ্ড। ম্যাকিন্যাক আইল্যাণ্ডে পৌঁছতে গেলে জাহাজে চড়তে হবে ম্যাকিনো শহর থেকে। আয়নার মতো ঝকঝকে নীল জল আর বরফের মতো ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টা দুয়েকের পথ পেরোলেই ম্যাকিন্যাকে পৌঁছে যাওয়া যায়।

মিশিগান অঞ্চলে থাকতে-থাকতে ম্যাকিন্যাক আইল্যাণ্ডের নানা গপ্পো কানে আসছিল। সবচেয়ে অবাক লাগল শুনতে যে, আমেরিকার এই একটা জায়গায় কোনও মোটরগাড়ি নেই! সাইকেল আর ঘোড়ারগাড়ি ছাড়া আর কোনও গাড়িই নাকি সেখানে চলতে দেওয়া হয় না। তাছাড়া, সেখানকার বাড়িঘর, তা সেগুলো যত নতুনই হোক না কেন, ধরনধারণে সে-সব দুশো বছরের পুরনো বাড়ির মতো। তারপর ম্যাকিন্যাক দ্বীপের ম্যানিবোজোর কাহিনীও কানে এল। সুতরাং আর কৌতূহল সামলাতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম একদিন সকালে ম্যাকিনো শহর থেকে ম্যাকিন্যাক দ্বীপের উদ্দেশে।

ম্যাকিন্যাকে যাবার আগে খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে দেখি, অধিকাংশ আমেরিকানরাও এই দ্বীপটা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যা জানা গেল, তাতে ম্যাকিন্যাকের

ব্যাপারে ইনটারেস্ট আরও বেড়েই গেল।

এক সময়ে দ্বীপটি ছিল রেড-ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটি। সভ্য মানুষ এখানে আসতে ভয় পেত। রেড-ইণ্ডিয়ানরা নাকি তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনকে এই দ্বীপে পুঁতে রাখত। ম্যাকিন্যাক আইল্যাণ্ডের আসল নাম ছিল 'মিকিলিম্যাকিন্যাক'। রেড-ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় শব্দটার মানে রাক্ষুসে কচ্ছপ। রেড ইণ্ডিয়ান দেবতা ম্যানিবোজো মৃতদের সঙ্গে বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে খেলা করার জন্যেই নাকি এই দ্বীপটা তৈরি করেছিল।

আজ যে ম্যাকিন্যাক বন্দর দেখে আমরা মুগ্ধ হচ্ছি, তা কিন্তু ইংরেজদের তৈরি। ১৬৭০ সাল থেকে ম্যাকিনো শহর আর ম্যাকিন্যাক আইল্যাণ্ডের মাঝের ঐ জলপথে সৈন্যসামন্তের যাতায়াত শুরু হয়। তারপর ১৭৭৯ সালে—আমেরিকান বিপ্লবের সময় সেটা—ম্যাকিনো শহরের ব্রিটিশ বাহিনীর কমাণ্ডার প্যাট্রিক সিনক্লেয়ার ভাবলেন আমেরিকানরা হয়তো ম্যাকিনো শহরের দুর্গ আক্রমণ করতে পারে। সেই ভয়ে তিনি সৈন্যদের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে গেলেন ম্যাকিন্যাক দ্বীপে। সেখানে তৈরি হল ইংরেজ বাহিনীর নতুন দুর্গ। ম্যাকিন্যাক দ্বীপে বেড়াতে গেলে ফোর্ট ম্যাকিন্যাক অবশ্যই দেখতে হয়।

এই দুর্গের ইতিহাস শুনলাম গাইডের মুখে। আমেরিকান বিপ্লবের শেষে দুর্গটি ইংরেজের হাত থেকে আমেরিকানদের হাতে চলে যায়। সিনক্লেয়ার তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলে যান কাছেই সেণ্ট যোসেফ দ্বীপে। তারপর ১৮১২ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এক রাতের অন্ধকারে আচমকা আক্রমণ করে এই দুর্গটি আবার নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। তবে পরে এক চুক্তি অনুযায়ী দুর্গটি মার্কিনিদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১৮৯৫ সালে ম্যাকিন্যাক দ্বীপের ইতিহাসে শুরু হয় নতুন অধ্যায়। দুর্গের সঙ্গে লাগোয়া বিশাল বাগানটি চলে যায় ম্যাকিন্যাক আইল্যাণ্ড স্টেট পার্ক কমিশনের হাতে। এর পর থেকেই এই দ্বীপের রূপ পরিবর্তন শুরু হল।

ম্যাকিন্যাক দ্বীপে পৌঁছেই মনে হল, একটা জলছবি যেন সত্যি হয়ে উঠেছে, আর তার মধ্যে আমরা ঢুকে পড়েছি। সবে বৃষ্টি হয়ে গেছে। যতদূর চোখ যায়, ঘন সবুজ বাগান। আর তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ চলেছে। কী আশ্চর্য চুপচাপ চারধার। আমরা এই দশকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই রয়েছি বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই। সত্যিই দেখলাম, মোটরগাড়ি তো দূরের কথা, মোটরবাইক পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হয় না এখানে। আশেপাশের বাড়িগুলো সব আনকোরা নতুন, কিন্তু কোনোটাই যেন এ-যুগে তৈরি নয়। চোখে পড়ল একটা ফার্নিচারের দোকান। দেখলাম, এই সব সেকেলে ডিজাইনের বাড়িতে সাজাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে আদ্যিকালের আসবাবপত্র। কেমন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেহারা আজ থেকে দেড়-দুশো বছর আগে, তার কিছুটা আঁচ করা যাবে ম্যাকিন্যাক দ্বীপে এলে। আধুনিক মার্কিন জীবনের সব সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা এখানে রয়েছে, কিন্তু একটা পুরনো দিনের মুখোশ পরিয়ে রাখা হয়েছে সমস্ত শহরটার ওপর—এটাই হল ম্যাকিন্যাকের মজা। এমন-কি একটা দোকানে দেখলাম পুরনো দিনের পোশাক পর্যন্ত ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দু-চারজন সাহেব দেখলাম সেই সব অদ্ভুত পোশাক

ভাড়া করে পরে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে লাগলেন। আমার ইচ্ছে করলেও পারলাম না। ছ-ফুটের কম লম্বা হলে আর ছেচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি না হলে ঐ সব পোশাক পরা যায় না!

হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছে গেলাম দ্বীপের ঠিক মাঝখানে, মার্কেট স্ট্রিটে। দু-ধারে সারি-সারি দোকান। বেশিরভাগই সুভেনিয়ার শপ। এইখানে প্রথম নজরে পড়ল ছোটদের জটলা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের একরত্তিরা ভিড় করেছে এখানে। এদের ভিড় কয়েকটি দোকানের সামনে, যেখানে লেখা 'কনফেকশনর্স'। সারা মার্কিন মুলুকে এই পুরনো ইংরেজি শব্দটা এখন আর চোখে পড়ে না। এখানে দুটি বাঙালি মেয়ের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল আমার। কিসের জন্যে লাইনে দাঁড়িয়েছে জিজ্ঞেস করতে ওরা বলল, ফাজ (fudge) না কিনে ওরা ছাড়বে না, কারণ "উই আর ফাজিস"।

ফাজের গন্ধে জিভে জল আসছিল। সুতরাং আমিও লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম ফাজ হল এক রকমের চকোলেট। খেতে দারুণ। তৈরি করার ব্যাপারটা আরও মজার। চকোলেটটা তৈরি হয় তামার কেটলিতে। আর জুড়নো হয় পাথরের টেবিলে। তারপর চকোলেটের পাতগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে রঙ-বেরঙের প্যাকেটে মুড়ে বিক্রি করা হয়। একশো বছর আগে আমেরিকান ছেলেমেয়েরা নাকি এই রকম 'হোম-মেড' চকোলেটই খেত। এখন সারা আমেরিকা ঘুরলেও ম্যাকিন্যাকের ফাজের জুড়ি মিলবে কিনা সন্দেহ।

আরও একটা জায়গায় দেখলাম তোমাদের মতো ছোটদের কিচিরমিচির সবচেয়ে বেশি। সেখানেও খাবারের গন্ধ। শুধু খাবার নয়, খাবারের সঙ্গে মজা। খাবারের গন্ধ থেকেই নতুনত্বটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। কাছে গিয়ে দেখি তৈরি হচ্ছে একের পর এক রেড-ইণ্ডিয়ান ডিশ। রাঁধুনি একটি আমেরিকান মেয়ে, কিন্তু সে মজা করে রেড-ইণ্ডিয়ান পোশাক পরেছে। এই রাঁধুনিকে ঘিরে রয়েছে ছোটদের ভিড়। এই রেড-ইণ্ডিয়ান রান্নাঘরের একটু দূরেই কিন্তু হ্যামবার্গার আর হটডগ দেখলাম বাজার জমিয়ে দিয়েছে।

আরও এক মজার দৃশ্য অপেক্ষা করেছিল ম্যাকিন্যাক দ্বীপের ক্যারেজ স্ট্রিটে। রাস্তার মাঝখানে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উজ্জ্বল লাল আর হলুদ রঙের ঘোড়ার গাড়ি। ঘোড়াগুলোর কী সাইজ রে বাবা! প্রত্যেকটা গাড়িতে দুটো করে ঘোড়া লাগানো। ম্যাকিন্যাক দ্বীপে বেড়াতে গেলে ঘোড়ারগাড়ি ছাড়া উপায় নেই। আরও একবার মনে হল আমি দেড়শো কিংবা দুশো বছর পিছিয়ে গেছি। ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলাম। দারুণ লাগছিল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

প্রথমেই আমরা এসে থামলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে। কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলের মতোই চমকলাগানো বাড়ি। আমি মুগ্ধ হয়ে বেশ কয়েকটা ছবি তুললাম। তারপর আবার মিনিট-কুড়ি পরে আমাদের ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল একটা বিশাল পাথরের সামনে। ম্যাকিন্যাকের এক রূপকথায় এই পাথরটার নাম 'সুগারলোফ'। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, লেক অ্যালগনকিনের মধ্যে ডুবে ছিল ঐ পাথর। জল সরে যেতেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রূপকথার গল্পটাই তোমাদের মতো আমারও বেশি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

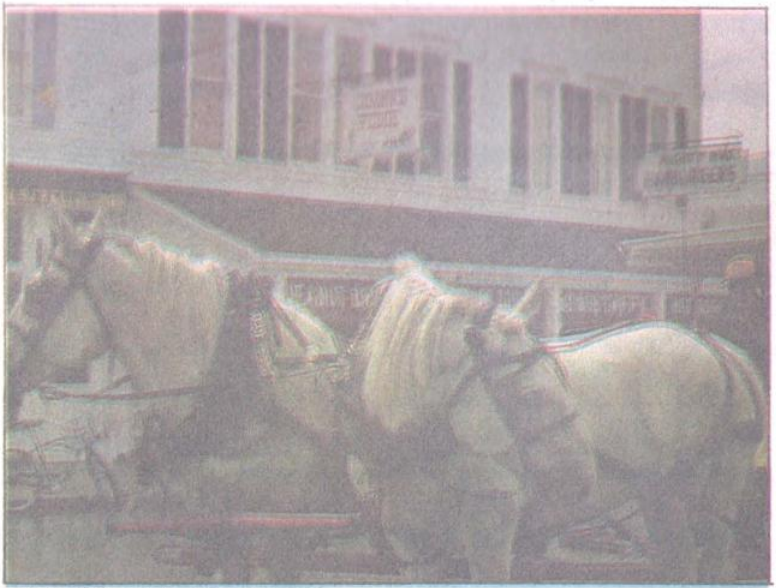

ক্যারেজ স্ট্রিটে ঘোড়ার গাড়ির মস্ত ঘাটি

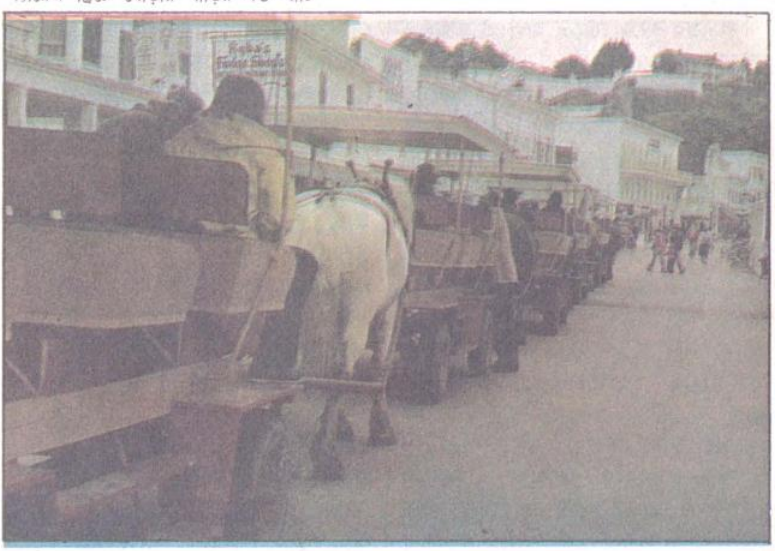

'উই আর অল ফাজিস'। ম্যাকিন্যাকের পথে

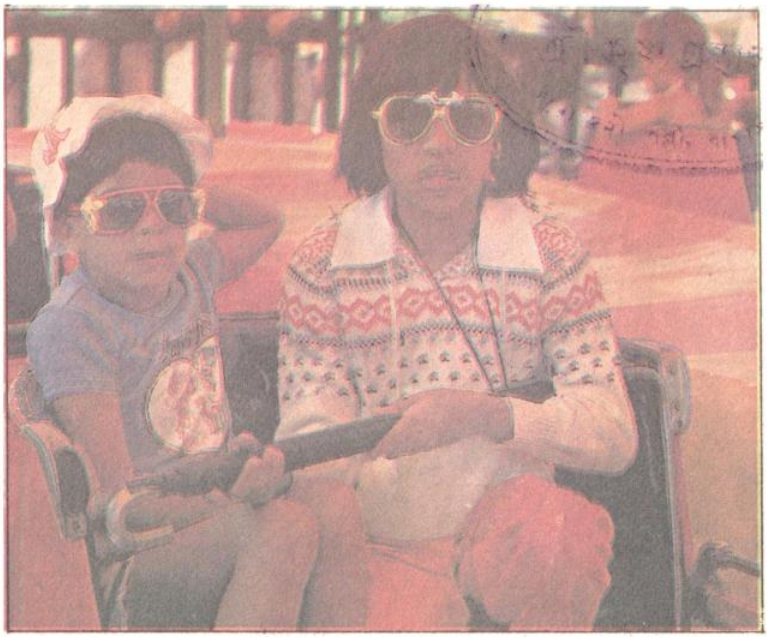

এই গাড়িটায় করে বেরিয়ে পড়লাম

ঐ পাথরের গা দিয়ে নাকি এক সময়ে মধু ঝরে পড়ত। রাতের অন্ধকারে মধুর গন্ধ বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেই ম্যানিবোজোর ঘুম ভেঙে যেত। আর ম্যানিবোজো বাঁশি বাজাত সারা রাত!

আরও একটা ছোট্ট সুন্দর গল্প গড়ে উঠেছে ম্যাকিন্যাকের গ্রেট আর্চ বা আশ্চর্য খিলানটি ঘিরে। লেক হুরন্-এর ১৪৬ ফুট ওপরে ঝুলছে এই খিলান। হাজার-হাজার বছরের জলবৃষ্টিতে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে সম্ভবত তৈরি হয়েছে এই আর্চ। কিন্তু সুন্দর গল্পটা তোমাদের না বলে পারছি না। এক যে ছিল রেড-ইণ্ডিয়ান কন্যে। নাম ছিল তার কুয়াশার মেয়ে। একদিন জঙ্গলের পথে ফুল কুড়োতে গিয়ে তার দেখা হল নীল আকাশের ছেলের সঙ্গে। কুয়াশার মেয়ে আর আকাশের ছেলে পরস্পরকে ভালবাসল। কিন্তু মেয়ের বাবা গেল রেগে। এই দ্বীপেরই একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে বেঁধে রাখা হল মেয়েটিকে। তারই চোখের জলে পাথর ক্ষয়ে-ক্ষয়ে নাকি তৈরি হয়েছে এই ঝুলন্ত খিলান।

আরও কিছুক্ষণ পরে আমাদের ঘোড়ার গাড়ি যেখানে এসে দাঁড়াল, সেখান থেকে যত দূর চোখ যায় পথ চলে গেছে সামনে। কোনও শব্দ নেই। মানুষজনও চোখে পড়ে না। শুধু পাইন, সিডার আর ক্রিসমাস গাছের ভিড়ে সবুজের ছায়া যেন আরও ঘন হয়ে এসেছে। কেমন যেন গা ছমছম করল। আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

পিন্টুর পিকনিক

মুস্তাফা নাশাদ

"সেবার পিকনিকে কী হয়েছিল জানিস ?" পিন্টুদা হঠাৎ তেলেভাজার ঠোঙা থেকে একটা গরম মুচমুচে বেগুনি চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই মুখে পুরতে পুরতে বলল।

পিন্টুদার এহেন ব্যাভারে 'আমরা কজনা'র চারজন সভ্য রাগে ফেটে পড়তে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেদের গুটিয়ে নিলাম। নইলে খোদ গল্পটাই শোনা হবে না। তাই রাগটা হজম করে তার দিকে বোকার মতো চেয়ে বললুম, "সেবার কী হয়েছিল পিন্টুদা ?"

জবাব দেবার আগেই ফের ঠোঙা থেকে পেল্লাই সাইজের দু'টো পেঁয়াজি সে তার বোয়াল মাছের মতো মস্ত হাঁয়ের মধ্যে চালান করে দিতে দিতে বলল, "কী করেই বা জানবি বল ? তোরা তো আর ঐ পিকনিকে যাসনি।"

"ঠিক ! বিলকুল ঠিক !" করিম মাথা চুলকে বলল, "তা ছাড়া তোমাদের পিকনিকে তো কোনোদিন ভুলেও আমাদের ডাকো না।"

"দূর বোকা, নিই না কি সাধে ?" বলতে-বলতে পিন্টুদা এবার তেলেভাজার ঠোঙাটাই হাতে তুলে নিয়ে বলল, "আমাদের পিকনিক যে তোদের মতো কচি খোকাদের নিয়ে করা সম্ভব নয়। এ তো আর তোদের মতো লো-বাজেটের পিকনিক

নয় যে, নমঃ-নমঃ করে সারলেই হল। বছরে একবার। কাজেই এর ঝক্কিও অনেক, ঝামেলাও অনেক, খরচও অনেক।"

তেলেভাজার ঠোঙাটা সাবড়ে দিয়ে টাবলুর মাথায় হাত মুছতে মুছতে পিন্টুদা বলল, "নে, এবার এক ভাঁড় গরম চা খাওয়া তো দেখি।"

কী আর করা যায়। ছিদামের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা এনে দিল টাবলু। পিন্টুদা তারিয়ে-তারিয়ে চা খেতে-খেতে তার পিকনিকের গল্প শুরু করল, "সেবার পিকনিকে কী হয়েছিল জানিস না তো?"

"কী করে আর জানব বলো? না বললে কি জানা যায় কিছু?" করিম এবার সত্যি-সত্যি রাগে ফেটে পড়ল। তার রাগারই কথা। কারণ, আজকে তেলেভাজা খাওয়ার পালাটা ছিল তারই। কোথা থেকে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে পিন্টুদা তার প্রায় সবই খেয়ে ফেলেছে। কাজেই আগামী কালও হবে করিমের খাওয়াবার পালা। আজ তো বন্ধুদের কপালে জুটেছে তেলেভাজার গন্ধ! তারা শুনবে কেন?

"সেবার পিকনিকে কী যেন হয়েছিল বলছিলে পিন্টুদা?" টাবলু কথার খেই ধরিয়ে দিল।

"সে এক এলাহি ব্যাপার। দাঁড়া দাঁড়া। সবই বলছি। মন দিয়ে ভাল করে শোন তোরা।" পিন্টুদা কী যেন ভাবতে-ভাবতে বলল, "আসলে কী জানিস, আমাদের পিকনিকে তো আর পাঁচটা সাদামাটা পিকনিকের মতো কোনো চাঁদার ব্যাপার

একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
আমায় দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!
চট্‌পট্‌ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এটা-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল এম-আর।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা--হাতি--বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল এম-আর।
গ্যাফি জিরাফ কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে,
সে বিষয়ে বিনামূল্যে তথ্যের জন্য এই কুপনটি এই
ঠিকানায় পাঠান: "ফেভি ফেয়ারী",
পোস্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০
নাম
বয়স
ঠিকানা
(A)
® এম-আর
ফেভিকল
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ
সেরা জিনিস গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও
® and FEVICOL brand are the Registered Trade Marks
OBM/1665

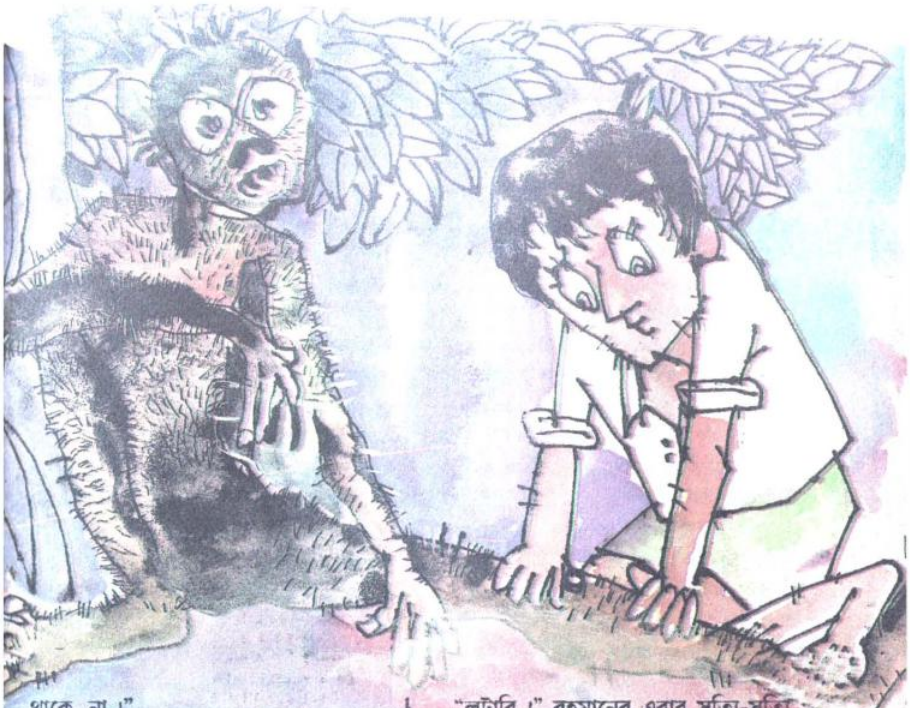

থাকে না।"

"তার মানে ?" পল্টু কথার মাঝে ফোঁস করে প্রশ্ন করে বসল।

"চাঁদা ছাড়া পিকনিক করো কী করে ?" এবার রহমানও জিজ্ঞেস করল, "চাঁদা ছাড়া আবার পিকনিক হয় নাকি ? আসলে আমাদের কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে তেলেভাজাগুলো খাওয়াই ছিল তোমার মতলব ! আজ ছিল করিমের পালা। এর পর ও কিপটেটা কি আর খাওয়াবে কোনোদিন !"

রহমানের কথা শুনে করিম রাগে জ্বলে যায়। সে কিছু বলার জন্য মুখ খোলার আগেই পিন্টুদা বলল, "চাঁদা ছাড়াও পিকনিক হয় রে হয় ! আর সেই কথা তোদের শোনাব বলে পাক্কা দু মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে আজ এসেছি রে ! আসলে কী জানিস, আমাদের পিকনিকে চাঁদা হয় না ঠিকই ; তবে তার বদলে হয় লটারি ! দারুণ মজার ব্যাপার !"

"লটারি !" রহমানের এবার সত্যি-সত্যি অবাক হবার পালা।

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, লটারি !" পিন্টুদা বিজ্ঞের মতো বলল, "লটারি করে যার নামে যা উঠবে তাই তাকে যোগাড় করে দিতে হবে। তা, লটারিতে আমার নামে উঠল মাংস। এবার ঠেলা বোঝো।"

"ঠেলা কেন ?"

"ঠেলা ছাড়া একে তুই আর কী বলবি বল ? এক-দু কিলো মাংসের ব্যাপার হলেও হত। তা তো না। নেই-নেই করে দশ কেজি মাংস দিতেই হবে। চাট্টিখানি ব্যাপার নাকি ? তবে আমার নামে যখন মাংসের লটারি উঠেছে, তখন আমাকে পিকনিকের নিয়মানুযায়ী তা দিতেই হবে। না দিলে যে মান থাকে না ; বুঝলি ? হাজার হোক ইজ্জতের ব্যাপার !"

"হক কথা ! সত্যি বলতে কী, ওর কমে হয়ও না ! তা তুমি দিলে অত মাংস ? টাকা পেলে কোথায় গো ?" টাবলু না থাকতে

পেরে মুখ টিপে হাসতে-হাসতে বলল।

"ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়!" পিন্টুদার ঠোঁটে দেখা গেল মৃদু হাসির রেখা, "আসলে কী জানিস, শর্তটা হচ্ছে যে দশ কেজি মাংস আমাকে দিতে হবে। তা হাঁস, মুর্গি, বা ছাগল, খরগোশ—যারই মাংস হোক না কেন।"

"হুঁ! তারপর?" করিম বলল, "গো-ওন গো-ওন পিন্টুদা।"

"তোরা কি ঘুঘুমারির চরের নাম শুনেছিস?" পিন্টুদা জিজ্ঞেস করল।

"শুনেছি। কিন্তু; সে তো অ-নে-ক দূরে। আর, জায়গাটাও নাকি খুব খারাপ," টাবলু বলল।

"ঠিক শুনেছিস। তবে কী জানিস, শিকারের জন্য ওটা একটা আদর্শ জায়গা! নানা রকমের পশুপাখি গিজগিজ করছে। শুধু সাহসে একটু ভর করে গিয়ে পড়লেই হয়। দশ কেজি মাংস তো কোন্ ছার, বিশ কেজিও জুটে যেতে পারে চট করে।"

"ওমা! তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, তাই!" পিন্টুদা একটুক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর বলতে শুরু করল, "আঁধারভোরে এয়ারগান, কিছু দড়িদড়া, একটা ছুরি, অল্প কিছু রুটি-মাখন, বিস্কুট আর একটা শতরঞ্জি ঝোলায় পুরে দুগ্‌গা-দুগ্‌গা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। যখন নদীর ঘাটে পৌঁছলাম, তখন সবে আকাশটা একটু-একটু করে পরিষ্কার হতে শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে দু-চারটে পাখ-পাখালির কিচির-মিচির। খেয়াঘাটে দেখি হারান মাঝির পারানির ডিঙি নৌকোটা তখনও বাঁধা রয়েছে! সময় নষ্ট না করে ওটাতেই উঠে পড়লাম। আর খেজুর গাছে বাঁধা ডিঙির দড়িটা খুলে দিলাম। নদীতে তখন জোয়ার এসেছে। নৌকো স্রোতের টানে সোঁ-সোঁ করে সোজা ঘুঘুমারির চরের দিকে এগিয়ে চলল। ঘন্টা-খানেকের চেষ্টায় নৌকো ভেড়ালাম চরে। নৌকো বেঁধে যখন চরে নামলাম তখন এক্কেবারে সকাল হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে দিনের উজ্জ্বল আলো। চরে নেমে তো আমি একেবারে থ।"

"কেন? কেন?" চার বন্ধু একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

"চরে খরগোশ, হরিয়াল, ঘুঘু, শামুকখোল, বনমুর্গি, তিতির, হাঁড়িচাঁচা, কাদাখোঁচা আর বকে থিক-থিক করছে। এ যেন মাংসের অফুরন্ত ভাণ্ডার! ব্যস। আর আমাকে পায় কে। আনন্দে আমি তখন আত্মহারা।" পিন্টুদা একটু থামল। তারপর কী যেন ভেবে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, "শিকার করে-করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এদিকে দুপুর গড়িয়ে চলেছে। খিদে তেষ্টায় প্রাণ যায়-যায়। সঙ্গে আনা খাবারদাবার খেলাম গোগ্রাসে। তারপর একটা বিশাল বটগাছের প্রকাণ্ড ঝুরিতে দড়ি বেঁধে শতরঞ্জিটা পেতে একটা দোলনামতো তৈরি করে বিশ্রামের জন্য গা এলিয়ে দিলাম—আর ঠিক সেই সময়।"

"কী হল সেই সময়?" চার বন্ধু একসঙ্গে প্রশ্ন করল আবার।

"সেই সময়—সেই জনমানবশূন্য চরে কে যেন খ্যানখ্যানে গলায় বলল, 'ওঁরে বাঁবাঁ রে। গেঁলুম রেঁ। কোঁন হাঁড়-হাঁভাঁতে এঁসে জুঁটল রেঁ?'

"গলা শুনে গাছের ওপর দিকে তাকিয়ে আমার ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা হল। কী দেখলাম জানিস?"

"কী দেখলে?"

"দেখি, গাছের মগডালে একটা দশাসই ভূত বসে তার পা-দু'টো নীচে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমি ভুল করে বটের ঝুরি ভেবে ওর ঐ গাবদা পা দু'খানায় একটু আগে দড়ি বেঁধে আমার বিশ্রাম করার দোলনা তৈরি করেছিলাম! আমার ভুল বুঝতে পেরে আর কালবিলম্ব না করে তড়াক করে দোলনা

থেকে নীচে নেমেই ছুট লাগালাম পোঁ-পোঁ করে নদীর ধারে, কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না রে।"

"তার মানে ?"

"পারলাম না। ধরা পড়ে গেলাম ওর হাতে। তড়াক করে গাছ থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে তার ইয়া বড় হাত বাড়িয়ে আমায় ধরে ফেলল। তারপর 'তোঁদের জ্বালায় কী এঁকটু পাঁয়ে রোঁদ লাঁগাঁতেও পাঁরবঁ না। জাঁনিস নাঁ যেঁ আঁমি বেঁতো রুঁগি।'

"বললাম,'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে ওটা আপনারই শ্রীচরণ! ভুল হয়ে গিয়েছে। দোষ হয়েছে আমার, স্বীকার করছি, ক্ষমা করুন। আর কখনো এদিকে আসব না।' আমি কাকুতি মিনতি করে বললাম।

"সেঁটি হঁচ্ছে নাঁ বাঁছাধন।' বেতো ভূত বাতের ব্যথায় কাতরাতে-কাতরাতে বলল, 'আঁমার পাঁ টেঁপ। যঁতক্ষণ নাঁ আঁমার ব্যঁথার উঁপশম হঁচ্ছে, তঁতঁক্ষণ তোঁমাকেঁও আঁমি ছাঁড়ছি নাঁ'।"

পিন্টুদা আবার থামল। সবার মুখের দিকে তাকাল। কারও মুখেই কোনো কথা সরছে না। সবাই যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

পিন্টুদা আবার বলতে শুরু করল, "পা টিপছি তো টিপছিই। ওর আর ব্যথা কমার কোনো লক্ষণই দেখি না। এদিকে তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হতে চলেছে। আর একটু পরেই চারদিক অন্ধকারে ডুবে যাবে। তখন ? তখন কী হবে ? ঘাড় মটকে নিজের সঙ্গী করে নেবে না তো! এসব ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি খেলে গেল, আর আমিও অমনি ওর পা টেপা বন্ধ করে দিলাম। আমাকে হঠাৎ পা টেপা বন্ধ করতে দেখে বেতো ভূত জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, পাঁ টিঁপছিস নাঁ যেঁ ?'

"আমি বললাম,'তুমি কিন্তু আসলে ভূত নও !' 'আঁমি ভূঁত নঁই ! কী বঁলিস রেঁ ?'

"বললাম, 'ভূতরা শুনেছি যখন-তখন চেহারা পালটাতে পারে ! তুমি কী তা পারো ? যদি পারো তো, একটা ছাগল হয়ে দেখাও তো দেখি কেমন এলেম তোমার ?'

"বলামাত্র বেতো ভূত পলকে একটা নধর পাঁঠার চেহারা ধারণ করে ব্যা-ব্যা করতে লাগল। তাই দেখে আমার মনে পড়ে গেল একটা চিনা প্রবাদের কথা। ভূতের গায়ে থুতু দিলে নাকি ভূত আর তার রূপ পালটাতে পারে না। ব্যস, আমি সময় নষ্ট না করে ওর গায়ে একদলা থুতু দিলাম। অমনি ও নাকি সুরে বলতে শুরু করল, 'এঁ কী কঁরলি রেঁ ? তোঁর মঁনে এঁই ছিঁল রেঁ !' বলেই যেই না পালাতে যাবে অমনি আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে বাছাধনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললাম। তারপর নৌকোয় তুলে এপারে নিয়ে এলাম। গত রোববার সেই নধর পাঁঠার মাংস দিয়েই না আমাদের অমন জব্বর পিকনিক হল !"

পিন্টুদা যখন তার গল্প শেষ করল, তখন অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে এসেছে। দু'হাত তফাতের কোনো জিনিসই ভালভাবে ঠাহর করা যাচ্ছে না। সবাই চুপচাপ। যে যার বাড়ি যাবার জন্য উঠি-উঠি করছে। আর মনে-মনে তারিফ করছে পিন্টুদার বুদ্ধি ও সাহসের। আর ঠিক সেই সময় সব নিস্তব্ধতাকে খান-খান করে দিয়ে বাঁশবাগানের ভিতর থেকে কে যেন নাকি সুরে বলে উঠল, "কী রে, তুঁই আঁমার নাঁমে এঁমনি সঁব মিঁথ্যে-মিঁথ্যে বাঁনিয়ে-বাঁনিয়ে বঁলবিঁ ? আঁসল ব্যাঁপারটি যেঁ কী তাঁ এঁবাঁর তোঁরা সঁবাই ভাঁল কঁরে শোঁন। চাঁটুয্যেঁদের পাঁঠাটাঁ হাঁরিয়ে গিঁয়েছিঁল ; মঁনে পঁড়ে ? ওঁটা কিন্তু আঁসলে হাঁরায়নি রে। ওঁটাকেঁই তোঁ ধঁরে নিঁয়ে গিঁয়ে ওঁরে বাঁবাঁ রেঁ। গেঁলাম রেঁ। বাঁতের ব্যঁথায় মঁলাম রেঁ।"

ছবি শেখর রায়

ফ্ল্যাশ গর্ডন

বারিনকে মরতে না-দিয়ে তুলে আনছে ফ্ল্যাশ...
উঠে এসো !
দয়া দেখাচ্ছ কেন ?
এরই নাম মনুষ্যত্ব !
এখন থেকে আমি তোমার অনুগামী
হঠাৎ...আকাশে...
উড়োজাহাজ
ক্লিটাস আসছে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

নোটোর দল

লীলা মজুমদার

আগে যা ঘটেছে ল্যাংড়া জানোয়ারদের নিয়ে পুরনো গোয়ালঘরে নোটোর দল 'দুঃস্থ পশুঘর' নামে চিড়িয়াখানা বানিয়েছিল। দাদুর প্রাইজ-পাওয়া গোরু-বাছুর রাখার জন্যে একদিন ঘর খালি করে দিতে হল। নোটোরা ঠিক করল, দুঃস্থ পশুদের পরিবনে রেখে আসবে। কিন্তু সে নাকি ভয়ংকর জায়গা। পরিরা নাকি ওদের মা-বাবাদের হরিণ করে দিয়েছে। নোটো বলে, ও-সব বানানো গল্প। ওখানে গেলে 'দুঃস্থ'রা নিরাপদে থাকবে। তাছাড়া মা-বাবাদেরও খুঁজে বের করতে হবে। এক রবিবারে মেলা দেখার নাম করে ওরা বেরিয়ে পড়ে। নানি পরিবন বা কুমিরজলায় যেতে বারণ করেছেন। জলার মধ্যিখানের ভূতখণ্ডে নাকি পরিদের রাজা থাকে। নকল মানুষ সেজে হাটে-বাজারে ঘোরে সে। মেলায় এক আশ্চর্য ওঝার গান শোনে ওরা। গানের মধ্যে যেন সুলুক-সন্ধান রয়েছে। ওঝা নোটোর হাতে 'জ্ঞানের ওষুধ' লেখা শিশি দেয়। সেই ওষুধ গায়ে মাখলে নাকি 'ভয়ে পালাবে ভয়।' এবার ওরা পরিবনের পথে। তারপর

॥ ৪ ॥

আসলে বনটা খুব দূরে নয়। নানি বলে, কাছে বলেই আরো ভয়ের। বাড়ির পেছনে খানিকটা ঘাসজমি। তাতে খুদে খুদে লাল নীল বেগুনি হলুদ সাদা ফুল ফুটে থাকে। তার পরেই পরিবন। বনের চারদিকে শক্ত কাঁটাতারের বেড়া। বনে গাছ কাটা বারণ। বনের কাছাকাছি সব বাড়িতে যারা থাকে, তারা আগে হয় পল্টনে, নয় বন-বিভাগে কাজ করত। পল্টনের লোকরাও পেনসিল নিয়ে বন-পাহারার কাজ করে। দাদুও আগে করত। বনে ঢুকতে পারমিট লাগে। বোমার আছে। ও বন-বিভাগ থেকে মাইনে পায় না বটে, কিন্তু ধূপকাঠ, আঠা, মধু এইসব আনতে পারে। ও বলে ছোট বন তত খারাপ হত না, যদি পরিদের উৎপাত না থাকত। ছোট্ বনের পর বড় বন। তার পর চোরা কাদা, তারপর কুমিরজলা। তারই নাম জগৎ-জলা।

এরা পাঁচজন কখনো পরিবনে যায়নি। এখানকার সব ছেলে-মেয়েদের যাওয়া মানা। আজ প্রথম গেল। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, ভাঙা বাঁশের ডাণ্ডা দিয়ে কাঁটাতার ফাঁক করে বন-বিভাগীরা ঢোকে। সেইখান দিয়ে। হাত-ধরাধরি করে বেশ খানিকটা দৌড়ে তবে ওরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক! বাইরে থেকে এ-জায়গাটা দেখা যায় না। এখানে পৌঁছলে বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। সব অচেনা অজানা। অন্যরকম গাছ। খরগোশ! সত্যি খরগোশ! একেবারে সত্যি খরগোশের মতো দেখতে! একটুও জাদু-খরগোশের মতো নয়। মৌ বলল, 'দিনের বেলায় জাদু-হরিণ, জাদু-খরগোশ বেরোয় না। এরা সত্যিকার জানোয়ার। আ আ তু তু তু!' কিন্তু তারা তুকতুক্ করে ল্যাজ নেড়ে দে ছুট।

অন্য গাছ, অন্য জানোয়ার। নিজেদেরও অন্য মানুষ মনে হতে লাগল। হঠাৎ শিরশির সরসর, খুরখুর খরখর! ঝোপঝাপ থেকে বেরিয়ে এল প্রথমে সাদা শেয়াল, তারপর কানা কচ্ছপ, তার পেছনে খ্যাঁক-খ্যাঁক করতে করতে বদমেজাজি বেজি আর হাঁটু-মচকানো হাড়গিলে। মাথার ওপর গাছের ডালে বড় মোরগ ছোট মোরগের গা ঘেঁষে বসে আস্তে আস্তে বলছে,

ক-র-র ক-র-র ! ওরা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না ! কানা কচ্ছপটা পর্যন্ত কাছে এসে মৌয়ের পায়ে মাথা ঘষতে লাগল। চোখটোখের কোনো অসুখ আছে মনে হল না। হাঁটু-মচকানো হাড়গিলে ডানা ঝাপটিয়ে অদ্ভুত নাচন দেখাল। বেজি কাউকে কামড়াচ্ছে না, কিচ্ছু না। বরং দেখে মনে হল ওর কান্না পাচ্ছে।দুঃস্থরা সব সেরে গেছে তাহলে ! কী আশ্চর্য, তবু চলে যাচ্ছে না। খাবার পাচ্ছে না, যত্ন পাচ্ছে না, তবু সঙ্গে চলেছে ! জাঁতাকলে পা পড়ে, সাদা শেয়াল খোঁড়া হয়ে গেছিল। সামনের বাঁ ঠ্যাং মাটিতে ফেলতে পারত না। এখন সে জোড় পায়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছে গত বছরের সার্কাসের সায়েবের সেই পোষা কুকুরটার মতো !

নিমাই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। নোটোদা ! ও সাদা শেয়াল নয় ! সায়েবের সেই কুকুরটাই হবে ! মনে নেই পালিয়ে গেছিল। বোমা বলেছিল সায়েব নাকি বড্ড মারত। সেই বোধহয় বনে গিয়ে জাঁতাকলে পড়েছিল। বোমা ছাড়িয়ে এনেছিল।'

তাই হবে। সাদা শেয়ালের নাম হুক্কা রাখা হয়েছিল। সে নাম কি তাকে মানায় ? তবু হুক্কা বলে ডাকলেই নেচেকুঁদে একাকার করে। নোটো বলল, ' আরো তাড়াতাড়ি হাঁটো। বড় বনে না ঢোকা অবধি বিশ্বাস নেই।' অমনি ওরা 'বড়-বন ! বড়-বন !' বলে দে ছুট ! দুঃস্থরাও ছোটে। কানা কচ্ছপের নাম কানু। কানু পেছিয়ে পড়ে। হেঁটো হাড়গিলে খানিক ছোটে ; খানিক ডানা ঝাপটিয়ে মাটির থেকে দশ হাত ওপরে ওড়ে আবার নেমে ঠোঁট দিয়ে কানুকে ঠেলে এগিয়ে দেয় ! মাথার ওপর মোরগরা গাছের ডালে ডালে উড়তে থাকে। সে এক বিচিত্র শোভাযাত্রা।

এক সময় থামতে হল। বড় বড় গাছ ; গাছের নীচে নীচে সবুজ ঘাস, রঙিন ফুল ; ফুল-ভরা ঝোপ ; ফুটকি দেওয়া হরিণ আর লাল-চোখ খরগোশ ; এদের রাজ্য শেষ হয়ে গেল। সামনে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। তার পেছনে ঘন বন। কালো অন্ধকার। বিশাল সব গাছের গুঁড়িতে, ডালপালায়, ঝুলন্ত শিকড়ে, মোটা মোটা কেঠো লতায়, সব জড়িয়ে একাকার হয়ে আছে।

কী করে যাবে ওরা ? এ-ওর মুখের দিকে চায়। হুক্কা থামে না। খানিকটা দৌড়ে যায়, আবার ছুটে ফিরে এসে বলে 'ভুক্' ! ল্যাজ নাড়ে। আবার এগিয়ে যায়। মাথার ওপর বড় কুঁকড়ো, ছোট কুঁকড়ো চাপা গলায় বলে 'কুকুর্‌র্‌ ! কুকুর্‌র্‌ !' অর্থাৎ 'ওর সঙ্গে চল !'

তাই যায় ওরা। এদিককার ছোট বনেও বড় বেশি ঝোপঝাপ, বড় বেশি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। তারই আড়ালে এক জায়গায় কাঁটাতারের উঁচু বেড়ার তলায় সুড়ঙ্গ !! বন-বিভাগের লোকরাই করেছে, নাকি জানোয়াররা থাবা দিয়ে খুঁড়েছে কে জানে। এই তো যাবার পথ !

ততক্ষণে হুক্কা, হেঁটো, বেজি, কানু, দুই কুঁকড়ো, সবাই সুড়ঙ্গের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। আগে নিমাই, তারপর মৌ, তারপর লটকান, তারপর ন্যাড়া, সবার শেষে ঝোপ থেকে ভাঙা মোটা লাঠি হাতে নোটো।

ওপারে গিয়ে নিমাই বলল, 'দাদুর বন্দুকটা থাকলে বেশ হত।' মৌ বলল, 'কী হত ?' ন্যাড়া বলল, 'দুম করে সিংহ মারতাম।' নোটো বলল, 'এ বনে বাঘ-সিংহ নেই, বোমা বলেছে। মিছিমিছি জানোয়ার মারতে হয় না।' লটকান বলল, 'যদি কিছুতে তেড়ে আসে ?' 'লাঠি-পেটা করব।'

একটু দম নিয়ে ওরা এগুতে থাকে। সে কী জঙ্গল। লাঠি দিয়ে নোটো লতা সরায় তবে ওরা এগোয়। নোটো বলে, 'দেখে দেখে পা ফেলিস। বড় ঘাসে, ঝোপেঝাপে সাপ থাকতে পারে। এমনিতে কিছু বলবে

না। মাড়ালে অন্য কথা।'

খিদে-তেষ্টা ভুলে গেল ওরা। এ বন বড় অন্ধকার। এখন সবে দুপুর শেষ হয়েছে। মনে হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা। জানোয়াররা মাটির কাছ দিয়ে হাঁটে, খুরখুর করে এগিয়ে যায়। ক্রমে ওদের সাড়া পাওয়া যায় না। গাছে সব অদ্ভুত ফল। একটা ঝোপে লাল লাল থোপা হয়ে ফল ঝুলছে। মৌ বলল, 'নিশ্চয় বেরি। আমাদের বইতে ছবি আছে।' নোটো বলল, 'ঠাণ্ডা জায়গায় বেরি হয়।' নিমাই বলল, 'দাদু বলেছে ওরা যখন বর্মার জঙ্গলে লড়াই করত, কাপ্তানরা বলত যে-ফল পাখিতে ঠোকরায় না, সে-ফল খেতে নেই।'

ঠিক সেই সময় কুকুরর্! কুকুরর্! বলতে বলতে বড় কুঁকড়ো ছোট কুঁকড়ো মাটিতে হেঁটে হাজির হল। তার পরে ঐ ফলের ওপর চোখ পড়তেই পাতি-মুরগির মতো কঁকর-কঁকর করতে করতে তার ওপর হামলে পড়ল।

ন্যাড়া মৌ লটকান মহা খুশি। নোটো বলল, 'পাড়ো, কিন্তু এক্ষুনি খেও না। ওদের কিছু হয় কি না দ্যাখো।' তা আর দেখতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক খুদে টিয়াপাখিও চ্যাঁ-চ্যাঁ করে ফল খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দেদার ছিল দু-তিনটে ঝোপ জুড়ে। সকলে নিল। মৌ তার গামছায় বেঁধে নিল।

ততক্ষণে হুক্কা ফিরে এসে ল্যাজ নাড়ছিল। ওরা তার সঙ্গে এগুল। কখনো নিচু হয়ে, কখনো গুঁড়ি মেরে, ছোট ছোট

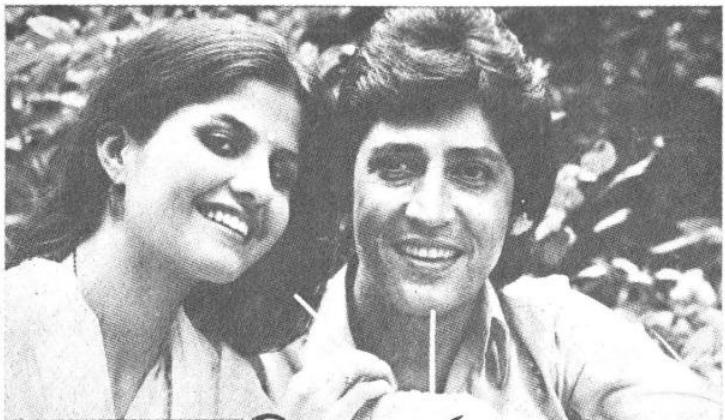

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন।

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়
কোলগেটের নির্ভরযোগ্য
ফরমুলা আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসকে
রাখে তাজা, নির্মল...
দাঁতকে রাখে শক্ত-মজবুত,
সুস্থ-সবল।

দেখুন কি ভাবে কোলগেট কাজ করে:

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের সৃষ্টি হয়।

কোলগেটের রাশি-রাশি ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয় সৃষ্টিকারী খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দূর করে, দাঁতকে পরিষ্কার, ঝকঝকে রাখে।

ফলাফল: তাজা, নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস, ক্ষয় থেকে সুরক্ষা আর সুস্থ-সবল দাঁত।

প্রতিবার খাবার পরেই কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না।
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূরে রাখুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

এর তাজা মিন্টি স্বাদ... সত্যিই চমৎকার!

GKGE B82 86 BN

জন্তু-চলা শুঁড়িপথ দিয়ে। হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে পায়ে যখন খিল ধরে গেছে, নিচু হয়ে হয়ে কোমরে ব্যথা, তখন একটা খোলামতো ফাঁকায় এসে ওরা ঝুপঝাপ বসে পড়ল। এখানে বড় গাছপালা কম, ঝোপঝাপ, ঘাস। আর ঠিক মধ্যিখানে ছোট্ট গোল একটা পুকুর। তার পাশে এবড়ো-খেবড়ো জায়গায় অদ্ভুত একটা পাথর। ফিকে গোলাপি, সাদা, ছাইরঙ মেশানো। মসৃণ মোলায়েম, চকচক করছে। সবাই দেখে অবাক।

নোটো তার ওপর একটু আঙুল ঘষে জিবে ঠেকিয়ে বলল, 'নোন্‌তা ! এটা নোনা পাথর। এই বনে অনেক আছে। বোমা নিয়ে যায়।' সবাই উঠে পড়ে ভিড় করে এল নোনাপাথর কেমন হয় দেখতে।

হঠাৎ ন্যাড়া বলল, 'নোনাপাথর জন্তুরা চাটে। দিদিমণি বলেছে। জল খেয়ে গর্তে যাবার আগে এক চাটন দিয়ে যায়। দিদিমণি বলেছে।'

লটকান বলল, 'তাহলে পুকুরটা ওদের জল খাবার জায়গা।' বাস্তবিকই তাই। খুরের দাগ, ছোট থাবার দাগ ; শুকনো নাদি পড়ে আছে। এ জলও তাহলে ভাল। ওরা মুখে হাতে জল দিল। আঁজলা করে জল খেল। পাড়ে বসে চাপাটি তরকারি খেল। বলা বাহুল্য হুক্কা, হেঁটো, বেজি, কানু, বড় কুঁকড়ো, ছোট কুঁকড়ো, সবাই ভাগ পেল। নোটোর ভাবনা হল এরা যদি চরে খেতে ভুলে গিয়ে থাকে, তাহলে ছাড়া পেয়ে বাঁচবে কী করে ? তার চেয়ে না হয় থাকবে ওদের সঙ্গে সারা জীবন। গাছে-টাছে রাতে শোবে। নাই বা পেল গোয়ালঘরে ঠাঁই।

খাওয়াদাওয়ার পর সবাইকে কুঁড়েমিতে ধরেছিল। নোটো ওদের বসতেও দিল না। 'সে হয় না ! চল্ চল্ চল্।' এ-সব জায়গা বোমার চেনা। এই পুকুর এই নোনাপাথরের ব্যবস্থা বন-বিভাগই করেছে।

মৌ লাফিয়ে উঠে বলল, 'তাহলে এ-জায়গা একটুও নিরাপদ নয়। চল, চল, আরো অনেক দূরে।'

লটকান আশ্চর্য হয়ে গেল, 'আরো দূরে কোথায় ?'

নিমাই বলল, 'মনে নেই সেই জগৎ-জলার ধার ?' একবার কিছু শুনলেই নিমাইয়ের মুখস্থ হয়ে যেত।

মৌ বলল, 'কী করে পার হব ?'

নিমাই বলল, 'ভাঙা নৌকো চড়ে হবি জগৎ-জলা পার !'

লটকানের বড় ভয়। 'জগৎ-জলা হল কুমিরবাদার নাম। কুমিরে খেয়ে ফেলবে।'

নিমাই বলল, 'অত ভয় কিসের ? মেললে আঁখি ভয় পালাবে, দেখবি চমৎকার !'

মৌ বলে, 'কোথায় পাব নৌকো ? আগে অবিশ্যি ওখানে জেলেদের গ্রাম ছিল। কিন্তু তাদের নৌকো চড়ে কি পার হওয়া যাবে ? ফুটোফাটায় ভরা হবে।'

নিমাই বলল, 'নৌকোর তলে ফুটো আছে, ওসব কিছুই নয়। ফুটোর ওপর বসলে চেপে, ফুটো বন্ধ হয়। তবে আবার ভয়টা কিসের ?'

ন্যাড়া বলল, 'আমি কুমির ভয় পাই।'

নিমাই বলল, ' দূর বোকা, মাখলে গায়ে জ্ঞানের ওষুধ, ভয়ে পালাবে ভয় ! তাহলে চল চল চল চল।'

মৌ তবু বলে, 'জ্ঞানের ওষুধ আবার কোথায় পাওয়া যাবে ?' নোটো এতক্ষণ জিনিসপত্র গোছগাছ করে তুলছিল। এবার পকেট থেকে ওঝার দেওয়া সবুজ শিশি বের করে বলল, 'এই যে, আমার পকেটে।'

আর কোনো কথা নেই। সবাই উঠে পড়ছে দেখে মাটি থেকে একটা চাপাটির কুচি চেটে নিয়ে হুক্কা সবার আগে রওনা দিল। বাকিরাও হাঁটা ধরল।

(ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন।
HTB-HLL-9267

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

॥ ৬ ॥

নিরানব্বই রান করে আউট হয়ে যাওয়া যে কী দুঃখের তা তোমাদের বলে বোঝাতে পারব না। যাঁরা এই দুঃখ পেয়েছেন কেবল তাঁরাই বুঝবেন এর যন্ত্রণা। তীরে এসে তরী ডোবা যাকে বলে এ হচ্ছে তাই। ওই সময়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতে আসতে মনে হয়, ক্রিকেট-বিধাতা কী নিষ্ঠুর! যেভাবে খেলে লোকে আউট হয়, তখন চিন্তা করে ওভাবে না খেললেই পারতাম। দূর ছাই, কেন ওভাবে খেলতে গেলাম। উইকেটটা খোয়া যেত না। হয়তো একটু পরেই আমার শতরান পূর্ণ হয়ে যেত। ক্ষোভ, হতাশা আর আক্ষেপে হৃদয় ভরে যায়। কিচ্ছু ভাল লাগে না। খাবার বিস্বাদ হয়ে ওঠে, বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে বিরক্তি লাগে। সবাই এসে পিঠ চাপড়ায়, সান্ত্বনা দেয়। তবু কিছুতেই নিজের মনকে শান্ত করা যায় না। বুকের ভেতর কেমন একটা খালি-খালি ভাব। কেবল মনে হয়, আহা, একটুর জন্য ফসকে গেল! এই আক্ষেপ সারাজীবন থেকে যায়।

আমার নিরানব্বইয়ে আউট হওয়া হঠকারিতা নয়, নিতান্তই দুর্ভাগ্য। নয়তো ওভাবে কেউ আউট হয়! ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়া দলে যে কজন স্পিনার এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচাইতে কম বিষ ছিল ক্লাইনের বলে। বাঁ-হাতি বোলার ক্লাইন লেগব্রেক বল দিতেন। ডানহাতি ব্যাটসম্যানের কাছে সেগুলো অফব্রেক হয়ে আসত। আমার কাছেও তাই। যে বলে আউট হয়েছিলাম সেটা পড়েছিল লেগ-মিডের ওপর। খুব সহজে 'পুল' করতে পারতাম। করলে বাউণ্ডারি হয়ে যেত নির্ঘাত। তাহলে সেঞ্চুরি হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমি ভাবলাম এত তাড়াহুড়ো করা ঠিক হচ্ছে না। আস্তে আস্তে খেলা যাক। উইকেটে থাকলে 'হানড্রেড' পাবই। বলটা লেগ-মিড থেকে অফব্রেক করে আরও বেরিয়ে যাচ্ছিল। পা বাড়িয়ে দিলাম। কাঁধের ওপর ব্যাট। প্যাডে লাগে লাগুক। এল বি ডব্লু হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু ওই বলেই যে আমার সর্বনাশ লেখা আছে, কী করে জানব! বল লাফিয়ে উঠে প্যাডের ওপরে থাইতে লাগল। তারপর সরসর করে শরীর বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত বুকের সামনে তোলা গ্লাভস ছুঁয়ে সামনে পড়ল। সিলি মিড-অনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তৎপর ফিল্ডার বেনো। তিনি বলটি হস্তগত করলেন। আমি কপাল চাপড়ালাম। যে বলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল না, সে বলই অস্বাভাবিকভাবে আমাকে তাঁবুতে ফিরিয়ে দিল। প্যাভিলিয়নমুখী হাঁটা পথে আমি নিজের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। কেন, 'পুল' করলাম না কেন? পরে ভাবলাম, নিয়তি খণ্ডায় এমন সাধ্য কার?

১৯৫৮ সালে আরও একটি নিশ্চিত

শতরান থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছিলাম। সেটা ঘটেছিল আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য। আলেকজাণ্ডারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলা হয়েছিল ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে। বোম্বাইতে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন উম্রিগড়। যদিও গোটা মরসুমে উম্রিগড় দলের নেতা হিসেবে মনোনীত হননি, তবু বিশেষ কারণে তিনি বোম্বাইতে অধিনায়কত্ব করেছিলেন।

সিরিজে নির্বাচিত অধিনায়ক গোলাম আমেদ বোম্বাইতে খেলতে চাননি। গোলাম ভাল ফিল্ডিং করতে পারতেন না। ব্যাটিংয়েও তথৈবচ। কিন্তু চমৎকার অফস্পিনার ছিলেন। মরসুমে অধিনায়কত্বের জন্য লড়াই হয়েছিল গোলাম ও পলির মধ্যে। শেষ পর্যন্ত গোলাম জিতলেন। বোম্বাইয়ের লোকদের ধারণা হয়েছিল, ষড়যন্ত্র করে পলিকে সরানো হয়েছে। তারা ক্ষুব্ধ হল। এদিকে খেলার কয়েকদিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন গোলাম আমেদ। আসলে ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে নামলে সারাক্ষণ লোক তাঁকে বিদ্রূপ আর কটূক্তি করবে এই ভয়ে গোলাম সরে রইলেন। বদলে দলে এলেন তরুণ লেগস্পিনার চন্দ্রকান্ত গুলাবরাও বোরদে। এবং অধিনায়ক হলেন পলি উম্রিগড়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে দুজন তরুণকে অন্তর্ভুক্ত করা হল—বেসিল বুচার ও ওয়েসলি হল। প্রথম ইনিংসে সুবিধে করতে না পারলেও দ্বিতীয় দফায় সাড়ে সাত ঘণ্টা খেলে ৯০ রান করলাম।

সময়ের তুলনায় রানসংখ্যাটা দৃষ্টিকটু লাগতে পারে। কিন্তু হল-গিলক্রিস্টের খ্যাপা ষাঁড়ের মতো বোলিং এবং রামাধীন-সোবার্সের প্যাঁচ-কষানো স্পিনের বিরুদ্ধে দ্রুত রান যে কী দুরূহ কাজ বলে বোঝানো শক্ত। যাই হোক, ৯০ রানের মাথায় চলে যেতে হল আমাকে আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে। অথচ ঠিক সেই মুহূর্তে সেঞ্চুরি পাওয়ার ব্যাপারে আমার আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। হলের দ্রুতগতির একটা বল ব্যাটের তলার দিকে লেগে মাটিতে পড়ে লাফিয়ে উঠল। ফলো-থ্রুতে এগিয়ে তা লুফে নিলেন বোলার। তারপর এগারো জন ক্যারিবিয়ানের চিৎকারে ভরে গেল মাঠ—হাউজ দ্যাট। অবাক হয়ে চারিদিকে চাইলাম। কী আশ্চর্য! বাম্প-ক্যাচ নিয়ে এত চেঁচাবার কী আছে? ওয়েস হল ছুটে এসে বল লুফে চেঁচালেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেও জানতেন ওটা ধাপানো ক্যাচ। নিশ্চিত ছিলাম, আম্পায়ার এ-বিষয়ে কর্ণপাত করবেন না। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আম্পায়ারের আঙুল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। বিস্ময়ের অন্ত রইল না। আম্পায়ারও ভুল বুঝলেন!

মনমরা হয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে সাজঘরে ঢুকলেন বিজয় মার্চেণ্ট। সে-খেলায় মার্চেণ্ট ধারাবিবরণী দিচ্ছিলেন। আমি আউট হওয়ার পর তাড়াতাড়ি নেমে এসেছেন। "পঙ্কজ, সত্যিই কি ওটা আউট ছিল?"

আমি চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। হাজারবার চেঁচিয়ে সত্যি কথা বলেও তো কোনো লাভ নেই। মার্চেণ্টই বা আমার কথা বিশ্বাস করবেন কেন?

"ওয়েল, কমেণ্টারি-বক্স থেকে বাইনোকুলারে দেখে মনে হল, তুমি আউট ছিলে না। বোধহয় ওটা বাম্প-ক্যাচ ছিল। তুমি কী বলো? ওয়েস হল কি বাম্প-ক্যাচ ধরেনি?"

উত্তরে আমি মতামত প্রকাশের দিকে গেলাম না।

"বাইনোকুলারের মধ্যে দিয়ে আপনি যখন গোটা ব্যাপারটা দেখেছেন, তখন আমার আর কিছু বলার নেই। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই আমাকে শান্তভাবে মেনে নিতে হবে।

কারণ, মাঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক হচ্ছেন আম্পায়ার।"

মার্চেন্ট জানতেন, আমি আউট ছিলাম না। সুতরাং, কিঞ্চিৎ দুর্বলতা তাঁর ছিল নিশ্চয়ই। এবার এই কথা তাঁকে মুগ্ধ করল। একটি সাহসী ইনিংস খেলবার জন্য তিনি আমায় অভিনন্দন জানালেন। পরে ধারাভাষ্য দেবার সময় আমার খেলা ও চমৎকার খেলোয়াড়ি মনোভাবের ভূয়সী প্রশংসা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। মার্চেন্টের সেই প্রশংসাবাণী আমার অতৃপ্তির ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিল। ৯০ রানে আউট হওয়ার দুঃখ কিছুটা প্রশমিত হল। তোমরা ভাবছ, এ আবার কেমন কথা, তাহলে আরও ঘটনার কথা বলতে হয়।

বোম্বাই টেস্টের বারোদিন আগে আমেদাবাদে একটা প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে যে দল খেলেছিল তাতে একমাত্র টেস্ট-ক্রিকেটার ছিলাম আমি। ওয়েস হলের বিরুদ্ধে সেই আমার প্রথম খেলা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথমে ব্যাট করল। প্রথমদিনে মধ্যাহ্নভোজের সময় দেখলাম ওয়েসলি হল আমার পাশে বসে খাচ্ছেন। হঠাৎ হল আমার কাঁধে হাত রাখলেন। "শোনো, তোমাদের দলে পঙ্কজ রায় নামে একজন ব্যাটসম্যান আছে। সে কে, আমায় দেখিয়ে দাও তো।"

স্পষ্টভাবে বুঝলাম, নাম শুনলেও হল আমাকে চেনেন না। কিন্তু সে যাই হোক, পঙ্কজ রায়কে খোঁজ করা কেন? যাচাই করে দেখা যাক না, ব্যাপারটা কী। ভালমানুষের মতো মুখ করে রইলাম। "কেন বলো তো? কী দরকার?"

হলও কম ধড়িবাজ নন। মুখে এতটুকু ভাবান্তর দেখা গেল না। "এমনিই।"

কথাটা বিশ্বাস হল না। এমনই? উহুঁ, এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। ভাবতে লাগলাম, কেন হল আমার খোঁজ নিলেন।

রামাধীন বল করছেন

সোবার্স ব্যাট করতে নামছেন

সব চেয়ে সুস্বাদু জলখাবার তৈরীর উন্নততর স্বাদিষ্ট পন্থা

নতুন!

MAGGI®

2-মিনিট নুডলস্

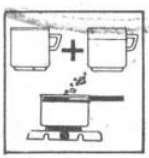

1. মাত্র দেড় কাপ জল ঢালুন এবং ফোটান

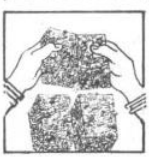

2. নুডল্সকে চারটি ভাগে ভাগ ক'রে নিন

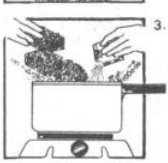

3. ফুটন্ত জলে নুডল্স ফেলে দিন টেষ্ট-মেকার সমেত

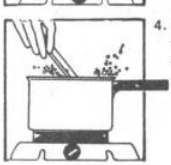

4. মাত্র মিনিট দুই ফুটতে দিন, মাঝে-মাঝে নাড়িয়ে দিন।

গরম পরিবেশন করুন স্বাদে অপূর্ব।

আপনি এই সহজ পদ্ধতিগুলি যখনই কাজে লাগাবেন তখনই কিন্তু ম্যাগি 2-মিনিট নুডলসের অপূর্ব স্বাদে আপনি রূপায়িত করাবেন।

ম্যাগি—এর একান্ত নিজস্ব বিশেষ টেষ্ট-মেকার রয়েছে, তিনটি চমৎকার সুগন্ধে—মসলা, চিকেন ও ক্যাপসিকা।
ম্যাগি—সর্বোচ্চ গুণমানের এবং ইতিপূর্বে বিরল সুস্বাদু রেঞ্জ।

141 R BEN

নীট ওজন 100 গ্রাম

রান্না হয় তাড়াতাড়ি! খেতে লাগে মজাদারী!

আমাকে একটু পরখ করতে চান নাকি ? হতে পারে। ঠিক করে ফেললাম, পরিচয় দেব। কিন্তু ইচ্ছে করে খারাপ খেলব এ-ম্যাচে। টেস্ট দলে তো আছিই। যা কিছু হওয়ার ব্রাবোর্নে হবে।

আমেদাবাদে ম্যাটিং উইকেটে হল মনের সুখে বাউন্সার-বিমার দিয়ে গেলেন। মারাত্মক বোলিং। বিষাক্ত সাপের মতো বলগুলো শরীরে ছোবল মারতে চাইছে। আমি বলের লাইন থেকে সরে গিয়ে খেলতে লাগলাম। বারোদিন পরেই টেস্ট। বলের লাইনে থাকতে গেলে যদি চোট লেগে যায়, তবে আমার টেস্ট খেলা হবে না। সুতরাং চুলোয় যাক এ-ম্যাচ। আমি বাপু বলের লাইনে গিয়ে খেলছি না। টেস্টের আগে হাত-পা ভাঙুক, খুলি ফাটুক, এ আমি চাই না। অতএব গা বাঁচিয়ে খেলতে গিয়ে সুবিধে করতে পারলাম না। মার্চেন্ট তখন জাতীয় নির্বাচন সমিতির সভাপতি। তিনি মাঠে হাজির ছিলেন। পরদিন একটি পত্রিকায় তীব্রভাবে আমাকে সমালোচনা করলেন। খুব দুঃখ হল মনে। এভাবে সমালোচনা করার আগে মার্চেন্ট একবার জিজ্ঞেস করতে পারতেন, কেন তুমি এরকম খেললে ?

আমার মাথায় জেদ চেপে গেল, এর জবাব আমাকে দিতেই হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে অকারণে বলের লাইন থেকে আমি সরে যাই না। এবং প্রমাণটা প্রথম টেস্টেই দিতে চাই।

এরপর বোম্বাইতে কী ঘটেছিল তা তোমাদের প্রথমে বলেছি। নব্বইতে আউট হওয়া দুঃখজনক। মার্চেন্টের প্রশংসা আদায় করাও বেশ শক্ত কাজ। বোম্বাইতে দুটোর স্বাদ একসঙ্গে পেয়েছি। মার্চেন্টের প্রশংসা আমার অতৃপ্তির ক্ষতে একটুখানি শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছিল।

[ক্রমশ]

ছোট্ট ছেলে ছোট্ট মেয়ে

সরল দে

ছোট্ট ছেলে শান্ত হবে,
ছোট্ট মেয়ে লক্ষ্মী—
কইলে কথা টের পাবে না
ধার-কাছে কাক-পক্ষী।
ভাবলে কেন ? ভাবলে কেন ?

ছোট্ট ছেলে বইটি পেলে
ছড়াং ছবি গল্পের
ভুলবে না তার বায়না, চোখে
আসবে নেমে জল ফের।
ভাবলে কেন ? ভাবলে কেন ?

ছোট্ট মেয়ে জানলা খুলে
চাইলে একা একলা
আসবে না ভাব করতে ফড়িং
হঠাৎ দিয়ে একলাফ।
ভাবলে কেন ? ভাবলে কেন ?

ওদের চোখে আকাশভরা
স্বপ্ন নেমে চিক্‌চিক্
করবে না আর, বড়র মতো
কইবে কথা ঠিক ঠিক।
ভাবলে কেন ? ভাবলে কেন ?

Duckback®
স্কুল ব্যাগ

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ

naa.BWL 8311

Duckback® মানেই সবার সেরা

কিশোর-ক্লাসিক

২০,০০০ লিগ্‌স আণ্ডার দ্য সি

জুলে ভের্ন

ভাষান্তর **শেখর বসু**

বিচিত্র সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল ১৮৬৬ সালটা।

এইসব ঘটনার কেন্দ্রে আছে সমুদ্রের রহস্যময় একটি বস্তু। অতিকায় চুরুটের মতো দেখতে অসম্ভব দ্রুতগতিসম্পন্ন উজ্জ্বল এই বস্তুটি বেশ কয়েকটি জাহাজকে ঘায়েল করেছে। এটিকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে নানা কথা ছড়াল। গবেষণা শুরু করলেন অনেকে, কিন্তু কেউই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। শেষে 'সমুদ্রের এই দৈত্যটিকে' নিয়ে কাফে-রেস্তোরাঁয় হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল।

মার্চ মাসে এই দৈত্যের কবলে পড়ল 'মোরাভিয়া' নামে একটি জাহাজ। অল্পের জন্য জাহাজটি ডোবেনি। পরের মাসে আক্রান্ত হল 'স্কটিয়া'। এই জাহাজটি কোনোমতে ফিরে এল লিভারপুলে। স্কটিয়াকে ডকে তুলে পরীক্ষা করতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের চোখ ছানাবড়া। জাহাজের তলায় ত্রিভুজাকৃতি বিশাল এক ক্ষত। কী করে এটা হল?

এই সময় নেব্রাসকাতে একটি বৈজ্ঞানিক সফর সেরে আমি ফিরছিলাম। প্যারিস মিউজিয়ামের প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপকপদে থাকার জন্যে সমুদ্রের 'দৈত্যটি' সম্পর্কে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম আমি। এই বিষয়ে বিভিন্ন কাগজপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টগুলি বেশ খুঁটিয়ে পড়তাম।

নিউ ইয়র্কে ফিরে শুনি আব্রাহাম লিংকন নামে একটি জাহাজ এই দৈত্যটির অনুসন্ধানে যাচ্ছে। এই অনুসন্ধানী-দলে যোগদানের জন্য একটি আমন্ত্রণ পেলাম। বুঝতে পারলাম, এই আমন্ত্রণ পাওয়ার পেছনে আছে সমুদ্র-জীবন নিয়ে লেখা আমার একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে।

সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না আমি। আমার চাকর কনসিল্‌কে সঙ্গে নিয়ে অনুসন্ধানী-দলে যোগ দিলাম। যথাসময়ে আটলান্টিকে ভেসে পড়ল আব্রাহাম লিংকন। জাহাজের ক্যাপ্টেন ফ্যারাগাট একজন সুযোগ্য নাবিক। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হল, রহস্যটির সমাধান করা হয়তো ক্যাপ্টেনের পক্ষে অসম্ভব হবে না।

জাহাজের সহযাত্রীদের মধ্যে একজন

নামকরা হারপুনার ছিলেন। নাম নেড ল্যাণ্ড, ক্যানাডার মানুষ। দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল কিন্তু সমুদ্রের কোথাও রহস্যময় সেই বস্তুটির চিহ্নও দেখতে পেলাম না আমরা।

একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় রীতিমত ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম। কোথায় গেল সেই দৈত্যটা? হঠাৎ এক সন্ধ্যায় নেড ল্যাণ্ড চিৎকার করে উঠে বললেন, "ওই তো সেটা!" তাকিয়ে দেখি সমুদ্রের ওপর বিশাল একটা বস্তু ভেসে উঠেছে। ভাল করে দেখার আগেই সেটা ছুটে এসে আমাদের জাহাজে একটা ধাক্কা মেরে মিলিয়ে গেল।

পরদিন সকালে আবার দেখা গেল ওটাকে। আবছা কুয়াশায় ওটাকে গ্রহান্তরের প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল। হঠাৎ ওটা তীব্রগতিতে ছুটে এসে আমাদের জাহাজকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। সেই ধাক্কায় সমুদ্রে ছিটকে পড়লাম আমি। সমুদ্রের জলে আরও দুজনকে পেলাম। এজন কন্‌সিল, অপরজন নেড ল্যাণ্ড। কন্‌সিলের কাছে শুনলাম, আমাদের জাহাজের হাল ভেঙে গেছে। জাহাজটা কাত হয়ে ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেল সমুদ্রের মধ্যে। তার মানে আমাদের বাঁচার সব আশা শেষ। অকূল সমুদ্রে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পরে সারা শরীর অবশ হয়ে এল আমার।

এমন সময় আমাদের তিনজনকে পিঠে চাপিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে একটা জিনিস ভেসে উঠল। প্রকাণ্ড মাছের আকারের এই বস্তুটি আসলে একটা সাবমেরিন। একটু বাদে সাবমেরিনের ঢাকনা খুলে আটজন মুখোশ-পরা লোক বেরিয়ে এসে আমাদের গ্রেফতার করে সাবমেরিনের ভেতরে নিয়ে গেল। বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছিল চারদিক। লোকগুলো আমাদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা এঁটে দিল বাইরে থেকে।

খিদে-তেষ্টা আর শীতে কাতর হয়ে পড়েছিলাম রীতিমত। নেড ল্যাণ্ড তো খেপেই গিয়েছিলেন। এভাবে আটকে রাখার কোনো মানে হয়?

বহুক্ষণ বাদে দরজা খুলে একজন স্টুয়ার্ড ঘরে ঢুকতেই নেড ল্যাণ্ড তার ওপর লাফিয়ে পড়ে ঘুষি চালাতে লাগলেন এলোপাতাড়ি। "যথেষ্ট হয়েছে, থামো এবার"—ওপাশ থেকে গম্ভীর গলায় কথাটা ভেসে আসতেই থেমে গেলেন নেড। গম্ভীর গলার এই লোকটি সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন বললেন, "আপনাদের নিয়ে কী করা যায় তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ ধরে। ভাবছি, জলে ডুবিয়ে মারলে কেমন হয়?"

"কিন্তু এটা কোনো সভ্য মানুষের কাজ নয়," উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলাম আমি।

আমার কথায় চটে গেলেন ক্যাপ্টেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "আপনাদের সভ্য-জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি আমি। তাছাড়া, আপনারা আমার শত্রু।"

"শত্রু!"

"শত্রু না হলে আব্রাহাম লিংকন নিয়ে আপনারা আমাকে ধ্বংস করতে আসতেন না।"

"আমরা তো আপনাকে ধ্বংস করতে আসিনি। আমাদের ধারণা ছিল, এটা একটা সামুদ্রিক দৈত্য।"

"দৈত্যের বদলে সাবমেরিন দেখলেও আপনারা ছেড়ে দিতেন না।"

ক্যাপ্টেনের কথার জবাবে এবার আর আমার কিছুই বলার থাকল না।

ক্যাপ্টেন অবশ্য আমাদের সঙ্গে বেশ সদয় ব্যবহার করলেন। তবে তাঁর এই সাবমেরিন 'নটিলাস'-এ আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী হয়ে গেলাম। ক্যাপ্টেনের নাম নিমো। ওঁর সঙ্গে চমৎকার একটা ঘরে ঢুকে ব্রেকফাস্ট নিলাম আমরা।

ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে নটিলাস দেখালেন।

বিস্ময়কর সব ব্যাপার-স্যাপার। নটিলাস পুরোপুরি বিদ্যুতে চলে। আমার ধারণা ছিল না যে, এত বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়া সম্ভব! এই বিদ্যুৎ আবার উৎপন্ন হয় সমুদ্র থেকে।

ক্যাপ্টেনের লাইব্রেরি বইপত্তরে ঠাসা। ক্যাপ্টেন আমার সম্পর্কেও বেশ ওয়াকিবহাল। বললেন, "সমুদ্র নিয়ে লেখা আপনার বইটা পড়েছি, তবে সমুদ্র সম্পর্কে এখনও আপনার অনেক কিছু জানার বাকি আছে।"

বিশাল চেহারার নটিলাস দেখে আমি আমার বিস্ময় গোপন রাখতে পারলাম না। বললাম, "ক্যাপ্টেন, লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে এত বড় জাহাজটা আপনি বানালেন কী ভাবে?"

উত্তরে ক্যাপ্টেন জানালেন, নটিলাসের বিভিন্ন অংশগুলো পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিভিন্ন কোম্পানির নামে অর্ডার দিয়ে বানানো হয়েছে। তারপর সবগুলো জোড়া লাগানো হয়েছে নির্জন একটা দ্বীপে। কাজ শেষ হলে ওই দ্বীপে আগুন জ্বালিয়ে সাবমেরিন বানানোর সব চিহ্ন লোপাট করে দেওয়া হয়েছে।

বুঝতে পারলাম, ক্যাপ্টেন অসামান্য প্রতিভাধর ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর মুখে সব শুনে বিস্ময়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে এল প্রায়। কিছুক্ষণ বাদে ক্যাপ্টেন একটা বোতাম টিপতেই বিশাল একটা কাচের জানলা ফুটে উঠল নটিলাসের গায়ে। জানলার পাশে বিদ্যুতের জোরালো আলো। সেই আলোয় নাম-না-জানা অসংখ্য মাছ দেখলাম সমুদ্রে। ক্যাপ্টেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "শিকার করতে যাবেন সমুদ্রে?"

এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। নতুন ধরনের ডুবুরির পোশাক পরে ক্যাপ্টেন আর আমরা তিনজন শিকার করতে নামলাম সমুদ্রে। সমুদ্রের তলায় হাঁটতে-হাঁটতে শিহরন খেলে যাচ্ছিল সর্বাঙ্গে। অতুলনীয় প্রকৃতি। তবে বিপদ আছে। একবার তো হাঙরের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেলাম কোনোরকমে। কিছুটা এগোবার পরে ডুবন্ত জাহাজের ভাঙা-চোরা টুকরো, মানুষের কংকাল দেখতে পেলাম। সদ্য-ডোবা একটা জাহাজও চোখে পড়ল। একজন মৃত নাবিক জাহাজের স্টিয়ারিং হাতে নিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, হঠাৎ দেখলে মনে হবে জ্যান্ত মানুষ।

এইসব দেখতে দেখতে বারবার মনে

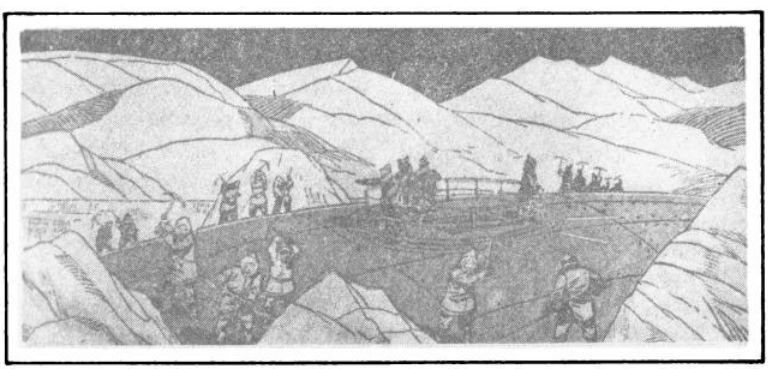

হচ্ছিল, ক্যাপ্টেন নিমো কেন এমন একটা অস্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন? সভ্যজগতের ওপর কী তাঁর অভিমান?

আমাদের বন্দিজীবনটা খুব একটা খারাপ ছিল না। আস্তে আস্তে দু-মাস কেটে যাওয়ার পরে ভারত মহাসাগরের এক বিপজ্জনক এলাকায় অগভীর জলে আটকে গেল নটিলাস। ক্যাপ্টেন জানালেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই, জোয়ার এলেই এটা ভাসবে। তবে, সামান্য কিছু মেরামতি দরকার নটিলাসের। দু-চারদিন হয়ত অপেক্ষা করতে হবে এখানে।

সামনে পাপুয়ার দ্বীপ। সাবমেরিন থেকে একটা নৌকো নামিয়ে সেই দ্বীপে গেলাম আমরা। বহুদিন বাদে দ্বীপে নেমে দারুণ লাগছিল। দ্বীপটাও অসামান্য। আমরা বেশ কিছু টাটকা ফল সংগ্রহ করলাম। তারপরেই বিপদ। বর্বর উপজাতির বিরাট একটা দল আক্রমণ করল আমাদের।

কোনোমতে নটিলাসে ফিরে এসেই ভয়ংকর এই বিপদের কথা জানালাম ক্যাপ্টেনকে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের কোনো ভাবান্তর হল না। আপন মনে অর্গান বাজাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর এতখানি নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ বুঝতে পারলাম একটু পরেই।

নটিলাসের বিদ্যুৎবাহিত সিঁড়ির রেলিংয়ে হাত দিয়েই প্রাণভয়ে পালাল উপজাতির দলটা। ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে জানালেন, অবাঞ্ছিত লোকদের তাড়াবার জন্যে এই ব্যবস্থাটা করে রেখেছি। দরকার পড়লেই রেলিংগুলো বিদ্যুৎবাহী হয়ে উঠবে।

যথাসময়ে আবার আগের মতো সমুদ্রে ভেসে পড়ল নটিলাস। বেশ কিছুক্ষণ নির্ঝঞ্ঝাট যাত্রার পরে হঠাৎ দেখি ক্যাপ্টেনের মুখ থমথমে হয়ে উঠেছে। কপালে ভাঁজ ফেলে দিগন্তের দিকে চেয়ে আছেন তিনি। আমি দূরবিন চোখে লাগাতেই ক্যাপ্টেন চটে উঠে সেটা কেড়ে নিয়ে বললেন, "আপনাদের কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে হবে এবার।"

যে কথা সেই কাজ। আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল বাইরে থেকে। কিছুক্ষণ পরে খাবার খেতে বসলাম আমরা। কিন্তু এ কী! খাবার খাওয়ার পরে মাথা ঝিমঝিম করছে কেন? বুঝতে পারলাম, ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল খাবারে। সজাগ থাকার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। আস্তে আস্তে রাজ্যের ঘুম নেমে এল দু'চোখে।

পরদিন সকালে চোখ খোলার পরে দেখি আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি। তার মানে ঘুমের মধ্যেই আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।

দুপুর দুটো নাগাদ ড্রয়িংরুমে বসে নোট লেখার সময় ক্যাপ্টেন ডেকে পাঠালেন আমাকে। ক্যাপ্টেনের ঘরে যেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি চিকিৎসক?"

বললাম, "হ্যাঁ, মিউজিয়ামে যোগ দেবার আগে আমি কয়েক বছর প্র্যাকটিস করেছি।"

উত্তর শুনে খুশি হলেন ক্যাপ্টেন। তারপর একজন আহত নাবিককে দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলেন আমাকে। নাবিকের আঘাত মারাত্মক। মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখি, প্রচণ্ড এক আঘাতে ঘিলু বেরিয়ে এসেছে। পরীক্ষা করে বললাম, "এর বাঁচার সম্ভাবনা নেই। আয়ু বড় জোর আর কয়েক ঘন্টা।"

যা বলেছিলাম তাই হল। মারা গেল নাবিকটি। পরদিন তাকে সমাধিস্থ করা হল সমুদ্রের তলায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

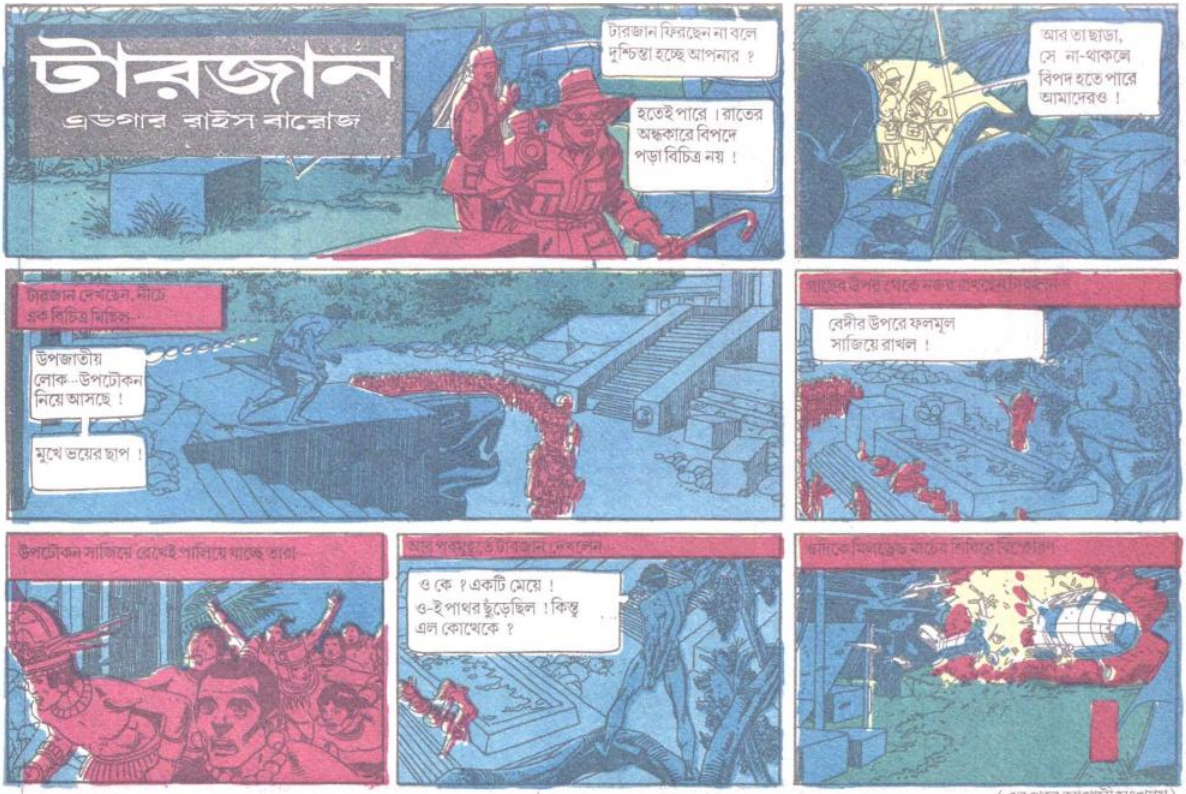

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
বদমেজাজি গাথরি রোভার্সের প্রাক্তন ম্যানেজারের মূর্তির সামনে মাথা নোয়াতে রাজি নয়…
গাথরি, শোনো !
দ্যাখো কাণ্ড !
কী অভদ্র !
এটা আমাদের ট্রাডিশন ! তাই আদেশ দিচ্ছি, মাথা নোয়াও !
আদেশ !
মাঠের বাইরে কারও আদেশ আমি মানি না !
কিন্তু ভিক…
রয় বুঝল, জোর করে লাভ নেই…
ওকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলতে হবে !
রিপোর্টাররা সব জেনে গেছে !
ওঃ, দারুণ খবর !
এবারে শুরু হবে হৈচৈ !
পরদিন সকালে…
খেলাধুলো
রোভার্সের ঐতিহ্যকে অপমান !
মাঠের খবর
গাথরি রয়ের কথা শুনল না !
মাথা নোয়াতে আপত্তি
ম্যানেজারের টেবিলে ক্লাব-সদস্যদের চিঠি আসছে !
সদস্যরা গাথরিকে চায় না !
আমি তাদের বুঝিয়ে বলব…
তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয় !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

সদাশিব তখন শাহজির দেওয়া আংটিটা জিজাবাইকে দেখায়

আংটি দেখে জিজাবাই অবাক।

সদাশিবকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে জিজাবাইও বলে ওঠেন—

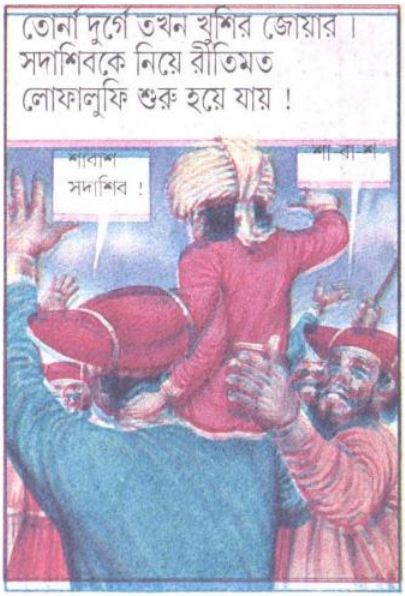

দুর্গের নিশান পত পত করে ওড়ে। সদাশিবের সম্মানে শিঙা বেজে ওঠে। সবার মুখে আজ একই কথা— **জয় সদাশিব !**

'সদাশিবের দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড' এখানেই শেষ

পরের অধ্যায়
'সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড'

ভূতেদের মান-সম্মান

প্রচেত গুপ্ত

আমাদের এই ছোট্ট শহরে বহুদিন যাবৎ জনাকয়েক ভূত আর আমরা মানুষেরা মিলেমিশে বাস করছিলাম। ওঁদের সঙ্গে আমাদের সুন্দর একটা বোঝাপড়া ছিল। ওঁরা শহরের উত্তরদিকের বনের ধারটায় থাকতেন। ভূতেদের 'ভৌতিক সংগঠন'-এর সঙ্গে আমাদের 'শহর-কমিটি'র যে চুক্তি হয়েছিল তাতে স্পষ্ট করে বলা ছিল, কোনোমতেই কেউ কাউকে জ্বালাতন করতে পারবে না। পিকনিক করতে যাওয়া ছাড়া আমরা সাধারণত বনের দিকটায় যেতাম না। ভূতেরাও শহরে এলে আমাদের মতো মানুষ সেজে আসতেন যাতে আমরা ভয়-টয় না পাই। তবু কতগুলো ভুল বোঝাবুঝির জন্যে ওঁরা অপমানিত হয়ে আমাদের শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

অনেক দিন বাদে বিদেশ থেকে বউ, ছেলে-মেয়ে নিয়ে মিত্তিরবাবুর বড় ছেলে হাবুলবাবু বাড়িএলেন। একদিন মাঝরাতে হাবুলবাবুর ছোট মেয়ে টুমি ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ বায়না ধরল, "বেড়াতে যাব।"

হাবুলবাবু টুমিকে বহু বোঝাবার চেষ্টা করে বললেন, "এত রাতে বেড়াতে যায় না।" কে কার কথা শোনে! টুমির কান্না থামে না। ধমক-ধামক দেওয়া হল। তাতেও কিছু হল না। শেষে হাবুলবাবু রেগে গিয়ে বললেন, "বাইরে বেরোলেই কিন্তু ভূতে ধরবে।" এই সময় দু'জন ভূত

রাত্তিরের ভ্রমণ সেরে ওই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে মানুষ আর ভূতের সম্পর্ক আরো কত মধুর করা যায় এই বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। হাবুলবাবুর কথাটা ঠিক এই সময়েই তাঁদের কানে আসে। অত্যন্ত অপমানিত হয়ে তাঁরা তখুনি ঘটনাটা 'ভৌতিক-কমিটি'র কাছে রিপোর্ট করেন।

অপমানিত হবারই কথা। এ-শহরের ভূতেরা কখনোই কাউকে ভয় দেখাননি, ধরা তো দূরের কথা। বহুদিন বিদেশে থাকার ফলে হাবুলবাবু বোধহয় এ-কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন। এই ভাবেই ভূতেদের সঙ্গে আমাদের ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত।

সেদিন এক বৃদ্ধ ভূতের খুবই রাবড়ি খাওয়ার শখ হয়েছিল। হাওয়া খেয়ে খেয়ে জিভের স্বাদটা যেন নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি নাতিকে ডেকে দুটো শেরশাহের আমলের মুদ্রা দিয়ে বললেন, "যা, শহর থেকে রাবড়ি নিয়ে আয়।"

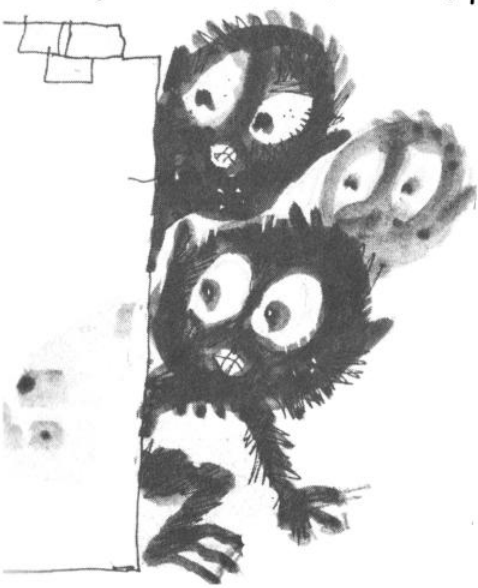

হাফপ্যান্ট, জামা-টামা পরে, মানুষ সেজে নাতিভূত তো বিশু ময়রার দোকানে এসে হাজির। বিশু তাকে রাবড়ি দিয়ে পয়সা নিতে গিয়ে দেখে দুটো অদ্ভুত চাকতি দিয়েছে ছেলেটা। বিশু অত না বুঝে ভেবেছে অচল পয়সা চালাচ্ছে। সে রেগে কাঁই হয়ে নাতিভূতের কান ধরে এক থাপ্পড় লাগাল।

সেদিন ভূতেদের মধ্যে একেবারে হৈ-হৈ পড়ে গেল। মানুষদের এই অপমান, এই অবিচার আর সহ্য হয় না। এরপরের ঘটনাটাই মারাত্মক। শহরে 'শহর-কমিটি'র ইলেকশন হবে। দুটো দল। দারুণ লড়াই। উত্তেজনা চরমে। মিটিং, মিছিলে সব সময়ই গম-গম করছে শহর। যাঁরা ভোট দেবেন তাঁদের নামের তালিকা তৈরি হয়েছে। দু-পক্ষই বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দেখে নিচ্ছে, ভোটার আছে কিনা। প্রতিপক্ষ দল যাতে মিথ্যে নামে জাল ভোট দিতে না পারে, তার জন্যে দু-দলই সতর্ক। ভোটের আগের দিন শহরে পোস্টার পড়ল অমুক দলের ভুতুড়ে-ভোটার মানছি না, মানব না।

দু-একজন অল্পবয়সী, উৎসাহী ভূত মানুষদের ভোট দেখতে এসেছিলেন। তাঁরা মোটেও জানতেন না যে জাল ভোটারদের 'ভুতুড়ে-ভোটার' বলে। তাঁরা ভাবলেন তাঁদের উদ্দেশেই বুঝি অমন লেখা হয়েছে। এতে তাঁরা রেগে গেলেন। সেইদিনই 'ভৌতিক-সংগঠন'-এর নেতৃত্বে সব ভূত আমাদের শহর ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে শুধু প্রতিশোধ হিসেবে হাবুলবাবুর মেয়ে টুমিকে একবার দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে গেলেন। বিশু ময়রার রাবড়িতে ঢেলে দিয়ে গেলেন জল। আর ভোট দেবার কাগজগুলোতে ইচ্ছেমতো ছাপ মেরে ফেলে দিয়ে গেলেন ভোটের বাক্সে।

ছবি দেবাশিস দেব

হ্যাঁ, আমি কিনা থথ্ ছেটাই ! তুমিই বলো, ছেটাই ? কী, কিছু বলছ না কেন ?
বেশ, আপনিই বলুন ! ছেটাই ?
ছাতা চাই !
নিয়ে আসছি !
!?
রাগছ কেন ? বন্দী দুজনকে নীচে রেখে এসো !
হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আমি পৃথিবীকে সব জানাই !
মুন রকেট টু আর্থ…ভয়াবহ ব্যাপার… রকেটের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকেছে…
উলফের সাহায্যে ঢুকেছিল…শেষপর্যন্ত তাদের বন্দী করেছি !
ইতিমধ্যে…
বাস, চুপচাপ এখানে বসে থাকো !
মিনিট কয়েক বাদে…
আচ্ছা করে বেঁধেছি !
উত্তম । এখন শোনো…
রকেট মেরামত করতে অন্তত একশো ঘণ্টা লাগবে ।
ফিরতেও কম সময় লাগবে না । অথচ অক্সিজেন আছে মাত্র একশো ঘণ্টারই । অর্থাৎ অক্সিজেনের অভাবে আমরা রকেটের মধ্যেই মারা পড়ব ।
কিন্তু এখনও আমরা বেঁচে আছি । সুতরাং মেরামতি শুরু হোক ।
মুন রকেট টু আর্থ…মেরামতি শুরু হচ্ছে…কিছু গান বাজান…
এক্ষুনি গানের ব্যবস্থা করছি ।
কাঁদছ কেন ? গান শুরু হবে ! ফূর্তি করো !
এখন শোনানো হচ্ছে সুরশিল্পী শুবার্টের 'দি গ্রেভডিগার'…
সময় যাচ্ছে…চাঁদে এখন রাত্রি…

কী হবে এবার ? আবার কি গুপ্তচরের হামলা শুরু হবে ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

সিমলিগড়ের বাগানবাড়ি

শচীন দাশ

দুধলিপুরের বেণীমাধববাবুকে এ-চত্বরে সকলেই এক কথায় চেনে। স্টেশনের টাঙ্গাওয়ালা, রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে পথচলতি লোকজন কিংবা বাজারে গিয়ে যাকেই জিজ্ঞেস করা যাক সে-ই আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবে, বেণীমাধববাবুকে চাইছেন তো আসুন,এদিকে আসুন ; ওই যে ওই বড় টাওয়ারটা দেখছেন ওর পাশ দিয়ে চলে যান, গিয়ে ডানদিকে বেঁকে বাঁ-হাতের প্রথম চার-পাঁচটা দোকানের পরেই দেখবেন বেণীমাধবের কারখানা।

কারখানই বটে। সারাদিনই একটা হামানদিস্তার ভেতরে ঠং-ঠং শব্দ করে নানারকমের জড়িবুটি থেকে শেকড়-বাকড়, হরতুকি, বয়ড়া ও যষ্টিমধু গুঁড়ো করে চলেন বেণীমাধব। পরে সেগুলোকে মধু দিয়ে মেখে ছোট-ছোট গুলি করে রোদে শুকোতে দেন। শুকনো বড়িগুলো এরপর সাইজ অনুযায়ী এক-একটা চিনেমাটির বয়ামে ভরে লেবেল লাগিয়ে ঘরের ভেতরে রেখে দেন।

ঘর বলতে মাঝারি সাইজের একটা খুপরি। চারদিকে ইটের দেওয়াল, ওপরে খোলার চাল। তারই একপাশে বাংলা ও হিন্দিতে লেখা একটা সাইন বোর্ড—কবিরাজ বেণীমাধব সেন, বি· এ বি· এল·, কলকাতা।

বয়সকালে বি· এ পাশ করে একসময় আইন নিয়েও পড়াশোনা করেছিলেন বেণীমাধববাবু। কিন্তু সেদিকে আর বেশিদূর যাননি। চাকরির খোঁজে এখানে-ওখানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এই শহরে এসে স্থায়ী হয়ে বসলেন। বেণীমাধবের ঠাকুর্দা আর বাবা ছিলেন নামকরা কবিরাজ। কবিরাজি সম্পর্কে তাঁদের বইটইও আছে। কাজেই বেণীমাধব যে তাঁর বাপ-ঠাকুর্দার রাস্তা ধরবেন এটা অনেকেই অনেকসময় ভেবেছিলেন। তাঁদের ভাবনাটা যে ঠিক এ-কথা প্রমাণ করার জন্যই যেন দুধলিপুরে এসে কবিরাজি নিয়ে বসলেন বেণীমাধব।

বসলেন, তবে পসার তেমন হল না। বাজার জমল না একেবারেই। লোক আসে না তাঁর কাছে। অসুখবিসুখে তাঁর ওষুধ না খেয়ে খায় পাশের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার জানকীরাম তেওয়ারির ওষুধ। তেওয়ারি ছাড়াও এ শহরে আরও দুজন ডাক্তার আছেন। তাঁরা অ্যালোপ্যাথিক। বিপদে আপদে তাঁদের কাছেই লোকে ছোটে। কাজেই এমন অবস্থায় বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে দাওয়াখানায় বসে বসেই দিন কাটছিল বেণীমাধবের।

যান সকালে, ফেরেন দুপুরে। কোনোরকমে দুটো খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার ছোটেন সেখানে। যদি দু-একজনও আসে, এই আশায় দোকান প্রায় খোলাই রাখেন সারাদিন। হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন বাইরের দিকে। কিন্তু তাকানোই সার। একজন দুজন করে রোগী আসে বটে, কিন্তু এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে তারা সাঁত্ করে জানকীরাম তেওয়ারির দোকানে ঢুকে পড়ে।

সেদিন বিকেল থেকেই মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝোড়ো হাওয়া। বাতাসের শোঁ-শোঁ গর্জন। গর্জনটা

মাঝে মাঝে থামে, বৃষ্টি জোরে নামে আবার বৃষ্টি একটু ধরে এলে বাতাসের হুংকার বাড়ে।

দরজাটা বন্ধ করে এসে চুপচাপ নিজের চেয়ারেই বসে ছিলেন বেণীমাধব, এমন সময় খুব বিচ্ছিরি একটা ঘুম এসে তার চোখে পাতাজোড়াকে যেন জোর করে বুজিয়ে দিল। আর পাতা বুজলেই যে কাণ্ডটা হয় সঙ্গে সঙ্গে পুরনো অভ্যেসটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বেণীমাধবের। নাকের গর্জন তুলে বেণীমাধব কখন যে ঘুমের ভেতরে চলে যান, নিজেরই তা খেয়াল থাকে না। এখনও তাই হল। সাদা ধবধবে ঝোলানো গোঁফের ওপরে প্রথমে নাকের পাটাদুটো মিনিটখানেক পর-পর কাঁপতে লাগল; তারপর ফত-ফড়াত শব্দ করে একটা হালকা আওয়াজ তুলতে তুলতে তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

এভাবে কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন মনে নেই, হঠাৎ একটা ঠকঠক আওয়াজে ধড়মড় করে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। "কে! কে ওখানে?" দরজার দিকে তাকিয়ে বেণীমাধববাবু উঠে দাঁড়িয়ে চটিতে পা গলালেন।

নিশ্চয়ই কেউ তাকে ডাকতে এসেছে। কিন্তু কে হতে পারে? তবে কি কোনো রোগী এল! নাকি রোগীর বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে কেউ। খুব উৎসাহ নিয়ে বেণীমাধববাবু দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু দরজা খোলার আগেই টের পেলেন চাপা গলার শব্দ। যেন খুব সাবধানে কেউ তাকে ডাকছে। "কবিরাজ মশাই—ও কবিরাজ মশাই, দয়া করে একবার দরজাটা খুলবেন। খুব বিপদে পড়েছি।"

বিপদের কথায় বেণীমাধববাবুর সব সন্দেহ চলে গেল। বুঝলেন, রোগী এসেছে—নিশ্চয়ই কারও অসুখ।

দরজার খিল নামিয়ে কপাটদুটো হাঁ করে একটানে খুলে ফেললেন বেণীমাধববাবু। খুলতেই চোখে পড়ল একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ডাঁট-বাঁকানো ছাতা, কাঁধে গামছা, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি আর তারই ভেতরে ডান গালের ওপরে প্রকাণ্ড সাইজের একটা কালো আঁচিল। বেণীমাধববাবুকে দেখেই মাথা নিচু করে প্রণাম জানিয়ে বলল, "আজ্ঞে আপনার কাছেই এসেছি কবিরাজ মশাই। আমার মনিবের খুব অসুখ। এখুনি একবার না গেলে তো চলছে না। যেতে হবে সিমলিগড়ের বাগানবাড়িতে। আমার মনিব ওখানেই আছেন।"

শুনতে শুনতেই বেণীমাধববাবু বেশ দমে গেলেন। ভেবেছিলেন রোগী নিজে এসেছে। না হলে হয়তো কাছাকাছি বাড়ি, তাঁকে নিয়ে যেতে কাউকে পাঠিয়েছে। তা

নয়, এখন রোগী দেখতেই যেতে হবে সেই সিমলিগড়। শহর থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূরে।

এমনিতে কোনো আপত্তি ছিল না। বরং গেলে কিছু রোজগারই হত। সুস্থ করে তুললে তাঁর কাছে লোকজনও আসত। কিন্তু এই ঝড়বৃষ্টির রাত। বৃষ্টিটা কমলেও আকাশ এখনও মেঘে ভারী হয়ে আছে। যে-কোনো সময়েই আবার হুড়মুড় করে আকাশ ভেঙে নেমে পড়তে পারে। তাছাড়া এতক্ষণ খেয়াল করেননি। দরজা খুলতেই এবার চোখে পড়ল, ছোট্ট শহরটা এতক্ষণে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আশেপাশে একটাও দোকান খোলা নেই। টাঙ্গা আর রিকশাগুলো সব পালিয়েছে। মানুষ তো দূরের কথা, এমনকী রাস্তার এদিকে-ওদিকে একটা কুকুরও চোখে পড়ল না বেণীমাধবের। তার মানে! কটা বাজে এখন?

বুক-পকেট থেকে কালো ফিতেয় বাঁধা ঘড়িটা বের করে দেখলেন, রাত বারোটা বেজে পাঁচ! আশ্চর্য! এতক্ষণ একটানা ঘুমিয়েছিলেন তিনি। যা গরম পড়েছিল! হঠাৎ এমন ঝড়বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ঘুমটা বেশ জাঁকিয়ে এসেছিল। কিন্তু বাড়িতে তো এরই মধ্যে চিন্তা শুরু হয়ে গেছে। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু বড় মেয়ে আর বউ নিশ্চয়ই গালে হাত দিয়ে ভাবছে। বেরিয়ে যে খোঁজ নেবে তারও উপায় নেই।

বেণীমাধববাবু ভাবলেন, তার চেয়ে এ আপদ কাটানোই ভাল। কাজ নেই এখন ওর সঙ্গে গিয়ে। তাছাড়া সিমলিগড় কি এখানে? কতদূরের রাস্তা তার ওপর এই দুর্যোগের রাত! একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বেণীমাধব তাই বললেন, "না বাপু, এত রাত্তিরে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।"

লোকটা যেন তৈরিই ছিল। বেণীমাধবের কথার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, "না কবিরাজমশাই, 'না' বলবেন না। আপুনি না গেলে মনিব আমার বাঁচবে না। আপনি চলুন, গাড়ি এনেছি আমি—গাড়িতেই নিয়ে যাব আবার গাড়িতেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

"তা তো দেবে," বেণীমাধববাবু জানালেন, "এদিকে আমার বাড়িতে সবাই চিন্তা করছে এখনও ফিরিনি বলে। কটা বাজে খেয়াল আছে! প্রায় মধ্যরাত এখন।"

"আজ্ঞে মধ্যরাত বলেই তো আপনার কাছে এসেছি। এই রাতে এখন আর কার কাছে যাই বলুন তো? তাছাড়া—"

"তাছাড়া কী?" বেণীমাধব জিজ্ঞেস করতে গিয়েই দেখলেন, লোকটার চোখদুটো ধক্ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু একটু পরেই আবার মুখে হাসি এনে বলল, "মনিবের আমার কবিরাজি ছাড়া অন্য কিছুতে আবার বিশ্বাস নেই। আপনি চলুন কবিরাজমশাই।"

বলতে বলতে লোকটা হঠাৎ বেণীমাধবের পায়ের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে

পড়ল। পড়ল তবে চটপট পাটা সরাতে গিয়েই বেণীমাধববাবুর মনে হল আচমকা একটা দমকা হাওয়া যেন ওর পায়ের পাতা ছুঁয়ে চলে গেল। বেণীমাধব অবাক হওয়ার আগেই দেখলেন, লোকটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই ফতুয়ার পকেট থেকে একটা নোটের বাণ্ডিল বার করে বেণীমাধববাবুর দিকে এগিয়ে ধরেছে। "আজ্ঞে মনিব এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন আপনাকে দিতে।"

বেণীমাধব চমকে উঠলেন, "এত টাকা!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এতে হাজার আছে। চলুন কবিরাজমশাই। আর দেরি করবেন না। দেরি করলে—"

কথাটা শেষ হল না, মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল লোকটার। চোখ দুটো তেমনি ধক্ করে জ্বলে উঠল। সে দৃষ্টির সামনে বেণীমাধব এবারে কেমন জড়সড় হয়ে পড়লেন। টাকাটা নিয়ে বুক-পকেটে রেখে লোকটাকে দাঁড়াতে বলে ভেতরে ঢুকলেন। পরে খল-নুড়ি, ওষুধ-পত্তর থেকে মধুর শিশি বড় এলাচ আর কিছু মৌরি-ভেজানো একটা জলের শিশি ব্যাগে ভরে যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন দেখলেন বহু পুরনো আমলের একটা শেভ্রলে তাঁর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রঙ সাদা। সামনে হেডলাইটের মাথার ওপরে দুটো সোনালি ময়ূর। পেছনের দিকে কাঁচের গায়ে পর্দা ঝোলানো।

দরজা খুলে লোকটা বলল, "নিন আপনি পেছনে বসুন কবিরাজমশাই। আমি সামনে যাচ্ছি।" বলতে না বলতেই লোকটা উঠে পড়ল। আর তারপরেই গাড়ি চলতে লাগল ঝড়ের বেগে।

রাস্তা এখানে খারাপ নয়। দিনের বেলায় যদিও বা খানিকটা জ্যাম থাকে রাতের দিকে তো রাস্তা ফাঁকা। ফলে গাড়ি ছুটল তীব্রগতিতে। আর এতক্ষণে খোলা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে বেণীমাধববাবু বুঝলেন, তাঁর ভীষণ খিদে পেয়েছে। সেই কোন্ দুপুরে এসেছেন। তার ওপর দুপুরে প্রায় কিছুই জোটেনি বলা যায়। কাজেই খিদের আর দোষ কী! অথচ এখন মাঝ-রাত্তির। তাছাড়া এদিকের এই পাহাড়ি রাস্তায় খাবারের দোকানও তেমন কোথাও নেই। মাঝেমধ্যে আছে এক এই পাঞ্জাবিদের চটি। তা, সেখানে তো তড়কা রুটি ছাড়া কিছুই মিলবে না।

চুপচাপ বসে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিলেন, হঠাৎ গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। "কী হল! কী!" লোকটার দিকে তাকিয়ে বেণীমাধব জিজ্ঞেস করতেই সে জানাল, "আজ্ঞে আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। সেই কখন তো বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। দাঁড়ান আপনার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি।"

বলে খটাস করে দরজা খুলে লোকটা হঠাৎ অন্ধকারে হারিয়ে গেল। "না-না যেতে হবে না। কী হল কী—ও ড্রাইভার,

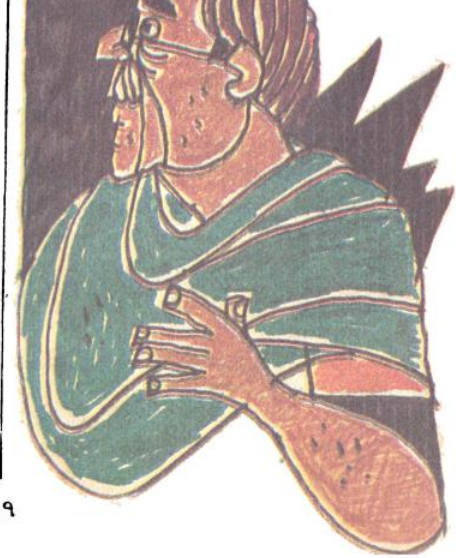

ও গেল কোথায় ?" জিজ্ঞেস করতেই বেণীমাধব চমকে উঠলেন ড্রাইভারের চোখ দেখে। উফ্—কী চোখ রে বাবা ! ভেতরের মণিদুটো কোথায় ! এ যে সবটাই অন্ধকার। দেখলে বুকের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা মেরে আসে। তবু অতিকষ্টে দৃষ্টিটা ফেরাতেই চোখে পড়ল দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেই লোকটা। হাতে একটা বড় শালপাতার ঠোঙা। বেণীমাধবের হাতে দিয়েই বলল, "নিন, গরম রসগোল্লা আছে। একটু মুখে দিয়ে নিন।"

"কিন্তু এখন এখানে খাবার পেলে কী করে ?"

বেণীমাধবের উত্তরে সে বলল, "কেন ময়রাদের দোকানে তো এখানে সারা রাত ধরে মিষ্টি বানানো হয়। কাল ভোরে ট্যুরিস্টরা সব সিমলিগড়ে বেড়াতে আসবে না ? তখন তাদের কী দেবে ? সেজন্য সারা রাত ধরে ময়রাদের চোখে এখানে ঘুম থাকে না। নিন, মুখে একটু দিয়ে নিন। তারপর বাগানবাড়িতে গিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে আসবেন।"

গরম রসগোল্লার গন্ধে প্রাণটা হঠাৎ নেচে উঠল বেণীমাধবের। আগে গরম রসগোল্লা খাওয়া একটা নেশা ছিল তাঁর। কিন্তু আজকাল আর ভাল পাওয়াও যায় না তেমন, তার ওপর খাওয়ার মতো পয়সাই বা কোথায় ?

বুকপকেটে টাকাটার ওপর একবার হাত দিয়েই টপাটপ দু-তিনটে রসগোল্লা মুখে ফেলে দিলেন বেণীমাধববাবু। সঙ্গে সঙ্গে পিরিচ করে একটা রসের ফোয়ারা বেরিয়ে এল। এই রে, ড্রাইভারের মুখে রস ছিটকে পড়েছে। কিন্তু ড্রাইভার তো মুখ ফেরাল না। কিছু বোঝেনি বোধহয়।

নিশ্চিন্তে এবার সবকটা রসগোল্লা মুখে পুরে বেণীমাধব সঙ্গের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী ভাই ? দেশ কোথায় !"

"আমার নাম রামশরণ। দেশ আরা জেলায়—বিহার।"

"আশ্চর্য ! তুমি এত ভাল বাংলা শিখলে কোথায় ?"

"কেন, দশ বছর বয়স থেকেই মনিবের কাছে আছি। ঘুরেছি অনেক জায়গায়।"

বেণীমাধব বললেন, "তা তোমার মনিবের কী হয়েছে বলো তো এবার ভাল করে। না শুনলে চিকিৎসা করব কী করে ?"

রামশরণ বলল, "আজ্ঞে, কলেরা !"

"কলেরা !" বেণীমাধব চমকে উঠলেন। বললেন, "তা দেখছে কে তোমার মনিবকে ?"

"আজ্ঞে আমি ছাড়া আর কেউ নেই তাঁর ! আমিই দেখছি। আপনি যেভাবেই হোক মনিবকে বাঁচিয়ে তুলুন। এতক্ষণে কথা বলার শক্তিও বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে।"

বেণীমাধববাবু আর কথা বাড়ালেন না। কিন্তু বাইরে তাকাতেই আবার চমকে উঠলেন। গাড়িটা ছুটছে পাগলের মতো। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে যেন উড়ে চলছে। "এ কী ! এত জোরে কেন ? এই রামশরণ ?"

রামশরণের কাঁধে হাত দেওয়ার আগেই এবার বেণীমাধবের নজরে পড়ল বিশাল একটা লোহার দরজা। হেডলাইটের আলো এসে পড়তেই দুপাশ থেকে দুজন দরোয়ান মিলে টেনে লোহার গেটটা খুলে দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বেণীমাধবকে নিয়ে গাড়িটা ভেতরে ঢুকল।

প্রথমে নুড়ি-বিছানো রাস্তা। তারপর বড় একটা ফোয়ারা। দু-তিনটে পাথরের পরি। সেসব পেছনে ফেলে গাড়ি গিয়ে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই দরজাটা খুলে ধরল রামশরণ।

বেণীমাধববাবু তাঁর ব্যাগটা নিয়ে নামলেন। এ-ঘর সে-ঘর হয়ে প্রায়

খান-দশেক ঘর পার হয়ে রামশরণের পেছনে-পেছনে যেখানে গিয়ে উঠলেন সেখানে বড় একটা হলঘরের মাঝখানে বিরাট একটা পালঙ্ক। তাতে ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা কে একজন শুয়ে আছে। আশেপাশে প্রচুর আসবাবপত্র। বসার জন্য সোফা, ডিভান আর নানা রঙের তাকিয়া। দেয়ালে বড়-বড় ছবি। একটা বন্দুক। হরিণের মাথা আর বাঘের ছাল ঝোলানো। ঠিক মাঝখান থেকে লম্বা সুতোর মতো একটা তারের সঙ্গে সুদৃশ্য একটা আলো ঝুলছে।

সেদিকে আঙুল দেখিয়েই রামশরণ বলল, "ওই—ওই যে আমার মনিব শুয়ে আছেন। আপনি যান আমি আসছি।"

আসছি বলতে না বলতেই রামশরণ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে কেমন একটা ভয় এসে জড়িয়ে ধরল বেণীমাধবকে। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বেণীমাধববাবু একটু অবাক হলেন। এত বড় বাড়ি অথচ কেউ নেই।

একটু গলা তুলে রামশরণকে ডেকে তিনি এবার এগিয়ে গেলেন। পালঙ্কের কাছে গিয়ে একবার দেখে নিয়ে বললেন, "কই দেখি,চাদরটা একটু সরান তো দেখি! শুনছেন!"

শুনলেন। তবে চাদরে ঢাকা মানুষটি বোধহয় চাদর সরাতে পারছেন না। সামান্য নড়ে উঠেই আবার শিথিল হয়ে পড়লেন।

কষ্টটা বুঝতে পেরে বেণীমাধববাবু আরও খানিকটা কাছে গেলেন। গিয়ে সাবধানে চাদরটা একটু সরিয়ে বলে উঠলেন, "দেখি, কী হয়েছে! কোথায় কষ্ট দেখি।"

কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। কথা শেষ না হতেই তিনি ভয়ঙ্কর চমকে উঠলেন। বিছানায় শুয়ে ও কে! চোখ নেই, মুখ নেই। গালে কপালে মাংসও নেই। চারদিকে শুধু হাড়। সাদা ধবধবে হাড়ের কঙ্কাল।

মুখ থেকে আর কথা সরল না বেণীমাধবের। কঙ্কালটা উঠে বসতেই আচমকা বিকট একটা আওয়াজ তুলে জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই তিনি পড়ে গেলেন।

জ্ঞান ফিরল ঠিক পরের দিন দুপুরে। চোখ মেলতেই দেখলেন সামনে অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। ভিড়ের ভেতরে তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েকেও নজরে পড়ল তাঁর। একটু সুস্থ হয়ে কী হয়েছে জানতে চাইলে সবাই বলল, তাঁকে পাওয়া গেছে সিমলিগড়ের বাগানবাড়ির কাছে। দুধলিপুরের এক ড্রাইভার দেখতে পেয়ে ভোরের দিকে তুলে এনেছে। কিন্তু তিনি কী করে ওখানে গেলেন?

উত্তরে বেণীমাধববাবু সব ঘটনাই জানালেন। শুনলেন, বাগানবাড়িটা সিমলিগড়ের জমিদারের। শেষবয়সে জমিদারি চলে যাওয়ার পর শুধু এক চাকরকে নিয়ে সেখানে থাকতেন। একবার সিমলিগড়ে ভয়ঙ্কর কলেরা শুরু হয়। কলেরায় আক্রান্ত হলে জমিদারকে বাঁচাবার জন্য অনেক ডাক্তারকে একবার যাওয়ার জন্য কাকুতিমিনতি করে তার প্রভুভক্ত চাকর রামশরণ। কিন্তু কোনো ডাক্তারকেই সে নিয়ে যেতে পারেনি। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। জমিদারের মৃত্যুর পর সেও কলেরায় মারা গেছে। সেই থেকে রামশরণ নাকি আজও তাঁর মনিবের জন্য ডাক্তার খুঁজে বেড়ায়।

কিন্তু সেই রসগোল্লা! রামশরণ যে তাকে রসগোল্লা খাওয়াল! সে কী করে ওই মিষ্টি নিয়ে এল? তাছাড়া—

পকেটে হাত দিয়ে বেণীমাধববাবু অবশ্য সেই হাজার টাকার কোনো চিহ্নও পেলেন না। তবে তিনি হাত পেতে যেটা নিয়েছিলেন সেটা কী?

ছবি দেবাশিস দেব

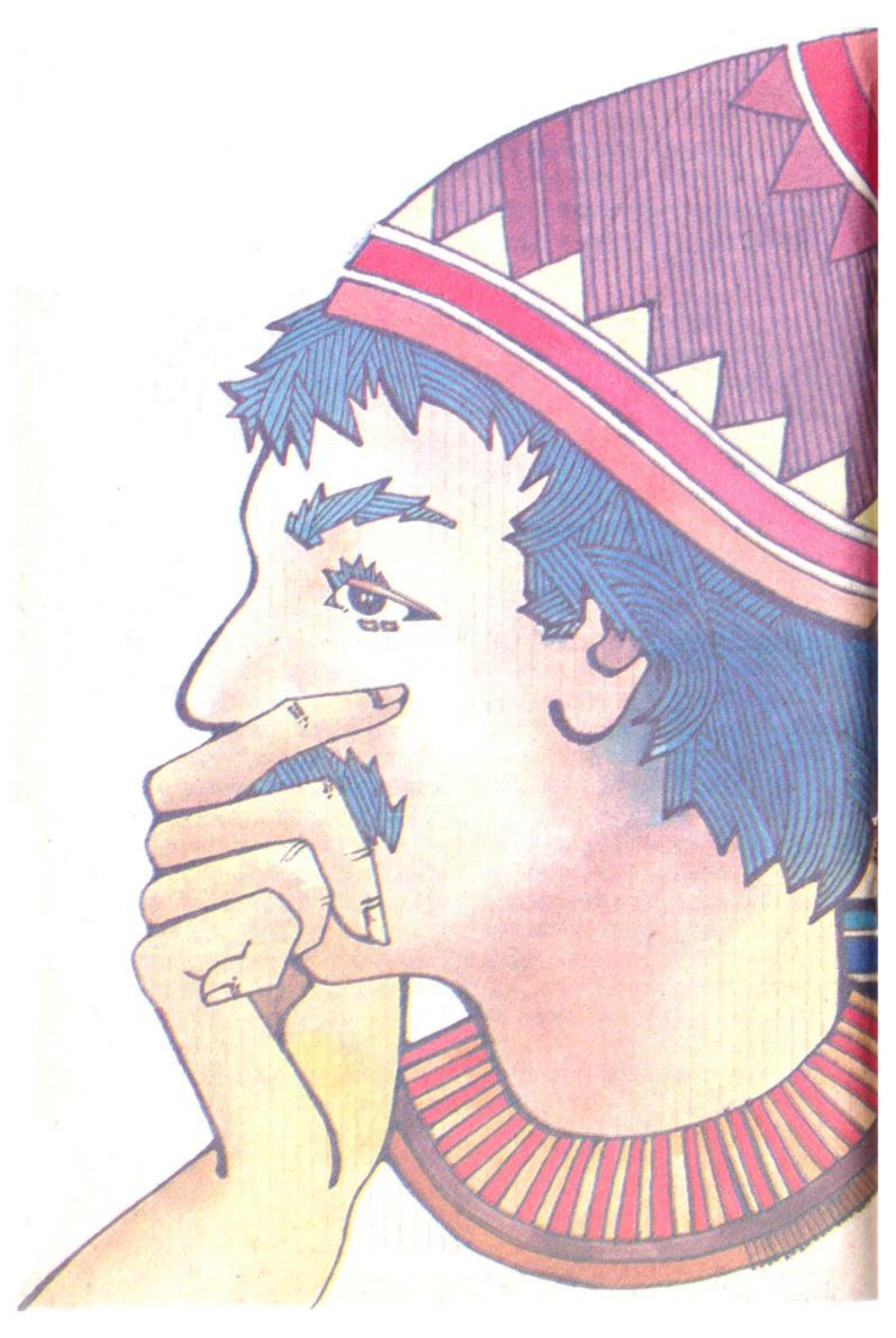

উপন্যাস

অভ্র নিখোঁজ

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

টেলিগ্রাম নয়, যেন বজ্রাঘাত !

অভ্র নিখোঁজ !

অভ্র নিখোঁজ, কিন্তু কবে কখন কী ভাবে—তার কিছুমাত্র উল্লেখ নেই টেলিগ্রামখানায়। অবশ্য তা থাকার কথাও নয়। টেলিগ্রাম মেয়েদের লেখা পোস্টকার্ড নয় যে, ঠিকানা লেখার বর্ডার লাইনও ছাড়িয়ে যাবে, তবু বলার কথা শেষ হবে না। যত সংক্ষেপে পারা যায়, মূল খবরটা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই হল টেলিগ্রামের উদ্দেশ্য।

এবং ছিলও তাই। ইংরিজিতে লেখা ছোট্ট তিনটি শব্দ যার বাংলা তর্জমা দাঁড়ায় : অভ্র নিখোঁজ। তলায় প্রেরকের নাম হিসেবে রয়েছে, সুনন্দ বাগচী, সি-সাইট, পুরী।

'সি-সাইট' তো যদ্দূর জানি একটা হোটেলের নাম। কিন্তু সুনন্দ বাগচী ? সে কে ? হোটেলের মালিক, নাকি ওই হোটেলেরই কোনো বোর্ডার ? নাকি স্থানীয় কোন বাসিন্দা ? হতভম্ব হয়ে এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময়ে আঁচলে হলুদের হাত মুছতে মুছতে সামনে এসে যিনি দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখেই তো আমার পিত্তি জ্বলে যাবার যোগাড় ! যত নষ্টের গোড়া তো এই ইনিই ! পই-পই করে তখন বললাম, মাথায় যতই লম্বা হোক, অভ্র তো এখনও সেই যে-বাচ্চা সেই-বাচ্চাই ! ও কি কখনো পারে এই ম্যাও সামলাতে ? ওর বয়েসই বা কত, বুদ্ধিই বা কতটুকু ?

কিন্তু কে কার কথা শোনে !

ক'দিন আগে হঠাৎ একদিন রাঁচি থেকে ওর রাঙা-মাসিমা এসে হাজির। কী, না পুরী যাবে। অফিসের কাজে দিন পনেরোর জন্যে সমর, অর্থাৎ অভ্রর মেসোমশাই গেছে জামালপুর, মেয়েগুলোও যে-যার বোর্ডিংয়ে, তাই এই ফাঁকে ঘরে তালা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়েছে সে। ক'টা দিনের জন্যে একটু হাঁফ ফেলাও হবে দিদির কাছে এসে, সেই অবসরে যদি সম্ভব হয় তাহলে বহুদিনের শখ একবার পুরীটাও ঘুরে আসা যাবে। কাজের চাপে আমার তো তখন নাকানি-চোবানি খাবার অবস্থা। অফিস-অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এমন এক গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছেন আমার এক ওপরওলা যে, তাঁর যাঁরা ওপরে আছেন সেই দিল্লিবাসী মিস্টার ভার্মা, মিস্টার কুলকারনি প্রমুখ হর্তাকর্তারা তো বলতে গেলে একেবারে যাকে বলে খড়্গহস্ত। ট্রাঙ্ককলের পর ট্রাঙ্ককল, রিপ্রেজেন্টেটিভের পর রিপ্রেজেন্টেটিভ, চিঠি-চাপাটি, টেলেক্স—সব মিলিয়ে সে যেন এক বিরাট ঝড় !

ঠিক এমনি সময়েই হঠাৎ একদিন গীতিকার আবির্ভাব। অর্থাৎ অভ্রর রাঙা-মাসিমার। সম্পর্কটা মিষ্টির, তাই অফিসের তিক্ততাটা যথাসম্ভব চেপে রেখেই ইয়ার্কি-ঠাট্টা-ফাজলামি আর হৈ-চৈয়ের মধ্যেই বাড়ির সময়টুকু কাটিয়ে চলেছিলুম কোনোরকমে। একদিন, গীতিকা তখন সিনেমায় গেছে, বীথিকা হঠাৎ বলে বসল, 'জানো, গিতু কী বলছিল ?'

বললাম, 'না বললে জানব কী করে

'বলছিল—' আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বোধ হয় বীথিকা একটু আমতা-আমতা করতে থাকে, 'ও কোনোদিন সমুদ্র দেখেনি—ছেলেবেলা থেকেই বড় ইচ্ছে দেখার, তা যদি তুমি যাবার কিছু বন্দোবস্ত করে দাও।'

হাতের পেয়ালার চা আর-একটু হলেই বোধহয় চল্‌কে পড়ত আমার। সামলে নিয়ে বলে উঠলাম, 'তুমি বলছ কী ! তোমার কি মাথা খারাপ ? এই অন্যায় আবদার তুমি এই সময়ে করছ কী করে ? হাসছি, কথা বলছি বলে কি তুমি মনে করছ, আমার সব ঝামেলা চুকে গেছে ? তুমি কি মনে করেছ—'

কথা আমার শেষ হবার আগেই বীথিকার গলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তোমার ঝামেলা কোনোদিনই শেষ হবে না ! আমি কোনো কথা বলতে গেলেই তুমি কেবল কাজ দেখাও—'

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না বীথিকা। পায়ের আওয়াজে রাগের মাত্রা তারায় চড়িয়ে সে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। ব্যস, সেদিনকার মতো কাজের দফা রফা আমার ! শুধু সেদিনকার মতো নয়, যতদিন না বাড়তি মাশুল গুনে যাতায়াতের রিজার্ভেশন করিয়ে পুরীর ক'খানা টিকিট তার সামনে এনে ফেলে দিলাম।

হাসি ফুটল আবার বীথিকার মুখে। বলল, 'তুমি অত ভাবছ কেন, গিতু খুব শক্ত মেয়ে, চিরকাল বাইরে-বাইরেই কাটছে তার,

অভ্র-শুভ্রকে নিয়ে ও বেশ ভালভাবেই ঘুরে আসবে দেখো ! এ তো আর আমি নই যে চিরটাকাল ঘরের কোণেই পড়ে রইলাম !'

শেষের কথাটায় তার যে শ্লেষ ছিল সেটা আমি যেন বুঝেও বুঝলাম না। ব্যক্তি-বিশেষের কাছে অনেক সময় বাক্যব্যয় বৃথা হয় জানতাম, তাই চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

কিন্তু এখন ? এখন কী জবাব দেবে শুনি ?

সাইকেল-পিওনের ডাক শুনেই বোধহয় বেরিয়ে এসেছিল বীথিকা। মুখখানা হাসি-হাসিই ছিল, কিন্তু আমার মুখের চেহারা দেখে কি না কে জানে, পলকের মধ্যে তারও মুখের ভাব পালটে গেল। সকৌতূহলে বলে উঠল, 'কে এসেছিল গো ? হাতে ওটা কী ? টেলিগ্রাম মনে হচ্ছে !'

'হ্যাঁ, টেলিগ্রামই।'

'কে করেছে ? গিতু ? খবর সব ভাল তো ?' বীথিকার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

কী জবাব দেব ? ঠিক খবরটা দিলে এখুনি তো হাউমাউ করে মড়াকান্না জুড়ে দেবে, সাত-সতেরো প্রশ্নের তীরে আমাকে একেবারে ভীষ্মের শেষশয্যায় শুইয়ে ছাড়বে। তাই গম্ভীর গলায় শুধু বললাম, 'খবর খুব ভাল। আমাকে এখুনি একবার বাইরে যেতে হবে। তুমি আমার ছোট্ট স্যুটকেসটা গুছিয়ে দাও।'

মুখে বললাম বটে স্যুটকেস গুছিয়ে দিতে, আসলে কিন্তু তখনও আমি ভেবে পাচ্ছি না কী করব বা কী করা উচিত আমার। এই সময় একজন কেউ কাছে থাকলেও না হয় যুক্তি করতাম কিছু। কিন্তু কেউ নেই আমার—কেউ নেই ! ঘরে ঢুকে রিসিভারটা তুলে নিলাম হাতে। ডায়াল করতে লাগলাম একটার পর একটা—অফিসে। লালবাজারের মিসিং স্কোয়াডের এক বন্ধুকে এবং সব শেষে আমাদের পারিবারিক বন্ধু মিঃ প্রতুল লাহিড়ীকে ; কিন্তু সব জায়গাতেই নিরাশ হতে হল। অফিসের বস ট্রাঙ্ককল পেয়ে দৌড়েছেন দিল্লিতে, মিসিং স্কোয়াডের বন্ধু শাশ্বত মুখার্জি ছুটিতে আছে, আর মিঃ প্রতুল লাহিড়ী ক'দিন হল চলে গেছেন কটকে। কটক—মানে পুরীর কাছাকাছিই, কিন্তু কত দিনের জন্যে, কাজে না বেড়াতে, কিছুই জানতে পারলাম না।

আমার মাথায় তখন কতরকম দুশ্চিন্তাই না পিপড়ের মতো কামড়াতে শুরু করেছে। আজকাল ছেলে-মেয়ে চুরির ঘটনা তো আকছারই মেলে খবরের কাগজে। পথ-দুর্ঘটনা তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। পুরীর সমুদ্র দৃশ্য হিসেবে যতই মনোরম হোক না কেন, তার খরস্রোত রেয়াত করে না কাউকে। হাড়গোড় ভাঙে, তালগোল পাকায়, সময় বিশেষে গ্রাস করতেও ছাড়ে না—এমন নজির, ক্বচিৎ হলেও, মেলে। জগন্নাথ এক্সপ্রেসে চেপেছে আজ ওরা দিন-সাতেক। নিজে গিয়ে তুলে দিয়ে এসেছি। কথা ছিল, গিয়েই একটা পৌঁছনোর খবর দেবে। কিন্তু পৌঁছনোর খবর দেওয়া চুলোয় যাক, সাতদিন বাদে একেবারে একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির, যার মূল বক্তব্য—অভ্র নিখোঁজ। তাও সেটা এসেছে কার কাছ থেকে ? না এমন-একজন, যার নাম-ধাম-পরিচয় কিছুই জানি না।

অনেক বেশি খেসারত দিয়ে টিকিট তো একখানা যোগাড় করলাম। তারপর অফিসে একটা জরুরি বার্তা পাঠিয়ে উঠে বসলাম গিয়ে ট্রেনে—যে ট্রেনে এই ক'দিন মাত্র আগে আমি নিজে এসে তুলে দিয়ে গেছি অভ্র, শুভ্র আর তাদের রাঙা-মাসিমাকে। সারাটা রাত ঘুম নেই চোখে। দুশ্চিন্তার হাজারো চিতা যেন পেছন থেকে আমায় তাড়া করে নিয়ে

চলেছে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। জানি না, রহস্যের কোন্ অতল গহ্বরে গিয়ে পড়ব শেষ পর্যন্ত।

॥ দুই ॥

পুরী-যাত্রা এই আমার প্রথম নয়। প্রথম যেটা, সেটা হল এইরকম একটা মন নিয়ে যাওয়া। ফলে, সাইকেল-রিকশায় তৃতীয় বাঁক নিতেই প্রকৃতির যে অপরূপ সৌন্দর্য অনন্ত মাধুরী নিয়ে একদিন দেখা দিত চোখের সামনে, সেদিন আর তা দিল না। যদিও শ্লেট-রঙা সেই অসীম জলরাশি একইভাবে দিগন্ত ছুঁয়ে টলটল করছে, রোদ-ঝিকমিক মাঝ-দরিয়ায় চাইনিজ ইঙ্কের আঁচড়ের মতো জেলেডিঙির সার সেই একই ভঙ্গিতে মাছ ধরায় ব্যস্ত, বালির পাড়ে ফেনিল উন্মত্ততার মধ্যে থেকে ভেসে আসছে আবহমান কালের সেই একই গর্জন।

ট্রেনের আওয়াজ, লোকের ভিড় আর তখন নেই ঠিকই, কিন্তু দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা প্রচণ্ড টেনশনে যেন টানটান হয়ে গেছে। মাথায় অসহ্য ভার, রাত-জাগা চোখে দুঃসহ ক্লান্তি। তবু, তারই মধ্যে ফাঁকা রাস্তার এধারে-ওধারে কেবলই তাকিয়ে চলেছি—কেবলই। যদি অভ্রর দেখা মেলে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা—কোথায় অভ্র ? রিকশার পথ ফুরিয়ে এল, শুরু হয়ে গেল হোটেলের সারি, মাথায় ছুঁচলো-টুপি নুলিয়ার আনাগোনা। ভোরের সূর্য দেখে ফেরা বায়ুসেবীর দল। সাইকেল-রিকশা, স্যুটকেস-কিটব্যাগ, নানা বয়সের হোটেল-যাত্রী, পাণ্ডা, হোটেলের দালাল—আরো কত কী। কিন্তু অভ্র তো দূরের কথা, অভ্রর আদলেরও কাউকে চোখে পড়ল না।

সি-সাইট হোটেলটা স্বর্গদ্বারের কাছ বরাবর, সমুদ্রের মুখোমুখি। রিকশা থেকে নেমে ভেতরে ঢুকে ম্যানেজারের ঘরের দিকে ছুটে গেলাম। একখানা মোটা বাঁধানো খাতায় ডটপেন দিয়ে টিক দিতে ব্যস্ত। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাতেই আমি খোঁজ করলাম সুনন্দ বাগচীর। শুনে অবাক হলেন ম্যানেজার, ভুরু কুঁচকে বললেন, "কিন্তু ও-নামে তো এখানে কোনো বোর্ডার

আমাদের নেই, স্যার।" খাতার পাতা পেছন দিকে উলটোতে থাকলেন তিনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা বুলোতে বুলোতে আবার বললেন, 'দু-চার মাসের মধ্যেও তো ও-নামে কেউ ওঠেননি এই হোটেলে। আপনি হোটেল ভুল করেননি তো ?'

পকেট থেকে টেলিগ্রামের কাগজখানা বার করে ম্যানেজারের সামনে মেলে ধরে

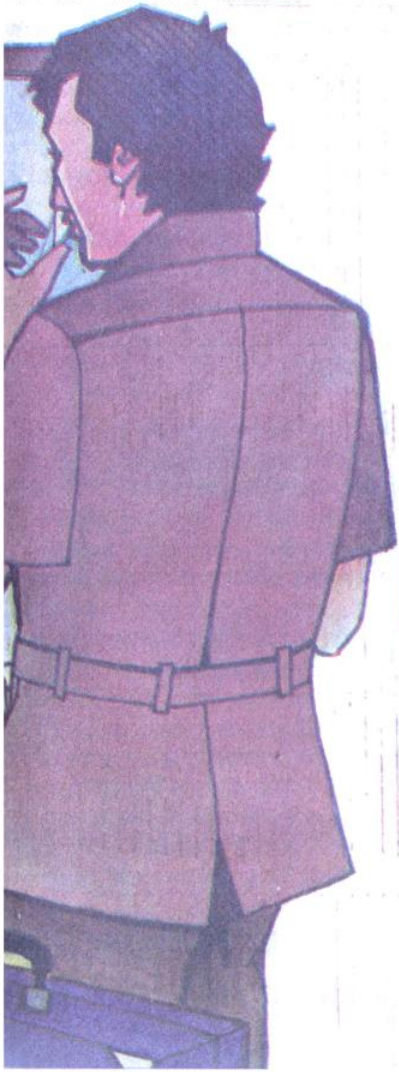

বললাম, 'এই দেখুন না, আপনাদেরই হোটেলের নাম। দিয়েছেন সুনন্দ বাগচী। আচ্ছা, এই নামে আর কোনো হোটেল-টোটেল নেই তো এখানে ?'

খাতা থেকে মুখ তুলে ম্যানেজার বললেন, 'এক নামে একই জায়গায় দুটো হোটেল তো থাকে না— সামান্য হলেও শব্দের হেরফের কিছু থাকবেই। যেমন ধরুন—'

'আচ্ছা, ওই নামে কোনো বাড়িটাড়ি—মানে কোনো বড়লোকের স্বাস্থ্যনিবাস-টিবাস ?'

'থাকতে পারে, আমি ঠিক জানি না। ওই চক্রতীর্থর দিকে—'

এই সময় নতুন একদল যাত্রী এসে পড়ায় আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ম্যানেজার। আমিও আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু যাব কোথায় ? উঠলে তো সেই হোটেলেই উঠতে হবে। তাহলে আর সি-সাইট দোষ করলটা কী ? তাই রিকশা থেকে সুটকেসটা নিয়ে ফের গিয়ে হাজির হলাম ম্যানেজারের ঘরে এবং বলে-কয়ে কোণের দিকে একখানা সিঙ্গল্-সিটেড রুমও বাগিয়ে নিলাম।

এখন, প্রথমেই যেটা দরকার, থানার সঙ্গে একটা যোগাযোগ করা। এ-ক্ষেত্রে করণীয়টা আমার তাঁরাই হয়তো বাতলে দিতে পারেন। কিন্তু তারও আগে দরকার গীতিকাকে খুঁজে বার করা। এ-হোটেলে ওঠেনি—ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি। তাহলে, সমুদ্রের ধারে সার-সার হোটেলের কোন্‌টায় উঠেছে তারা কে জানে। 'ভারত সেবাশ্রম' কিংবা অন্য কোনো ধর্মশালা, কি ছোটখাটো একটা ঘরভাড়া করে ওঠাও কিছু বিচিত্র নয়। আজকাল তো সব সময় হোটেলে পাব বললেই জায়গা পাওয়া যায় না ! ইতিমধ্যে

বেলা বেড়েছে, সি বিচের বালিও তেতে উঠেছে বেশ। বুকে উষ্ণতা নিয়ে যে হাওয়া বইতে শুরু করেছে, আমার মনে হল, সেটা আমার শূন্য মনের হাহাকারের কথা ভেবেই।

হোটেল থেকে বেরিয়েই সি বিচটা চক্কর দিতে শুরু করলাম। উলটোনো একখানা জেলেডিঙির পাশে একটা গোল ভিড়ের মধ্যে রুপোলি সি-ফিশের গাদা। বোধ হয় কেনা-বেচা চলছে। পলকের মধ্যে ভিড়ের মানুষগুলোর ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে দৃষ্টিটাকে নিবদ্ধ করলাম যেখানে নুলিয়ার হাত ধরে কিংবা না-ধরে সমুদ্রস্নান করছে ছেলেরা, মেয়েরা; বাচ্চারা। নিখোঁজ অভ্রর চিন্তা মাথায় নিয়ে গীতিকা আর শুভ্রর এই সময় ঠিক স্নান করার কথা নয়। তবু ভাবলাম যদি স্নান করা দেখতে আসে কিংবা অভ্রকে খুঁজতেও আসে!

প্রায় আধ ঘন্টা ধরে বলতে গেলে একরকম ছোটাছুটিই করলাম। শেষে নিরাশ হয়ে, সি বিচের প্রথম হোটেল থেকেই শুরু করলাম তত্ত্বতালাশ নেওয়া। একের পর এক। এমনকী পেছন দিকের খাঁজবাঁকে সুন্দর-সুন্দর হলিডেহোমগুলো পর্যন্ত। যদি পরিচিত কারো দেখা পেয়ে তার সঙ্গে গিয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, হোটেলগুলো প্রায় শেষ হয়ে এল, প্রতিটি হলিডেহোমে চিরুনি বুলিয়েও কোথাও কোনো সন্ধান মিলল না। মাথার ওপর রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে তখন। ঘাম ঝরছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। নোনা হাওয়ায় এবং তাপে মুখখানা, আয়নায় না দেখলেও জোর করে বলতে পারি, নুলিয়াদের চেয়ে কোনো অংশে কম কালো নয়। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

জ্বালা-করা চোখ নিয়ে ফিরে চললাম নিজের হোটেলের দিকে। আর ক'টা মাত্র হোটেল বাকি। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার

ঋতু বদল

বর্ষার শেষে যখন প্রথম শরৎ এলো তখন যেমন একবার ঋতু বদল হলো, আবার শীতের শেষেও তেমনি বসন্তের আগমনে আর একটা ঋতু পরিবর্তনের সময়। আসলে প্রত্যেকটা ঋতুরই যাওয়া এবং আসা এই দুটো সময়ই মারাত্মক।

এই সময়টাতে সাবধানে থাকা উচিত আমাদের। বিশেষত ছেলে এবং বুড়োদের। নইলেই চট্ করে ঠাণ্ডা লেগে যায়, গরম লেগে যায় মানুষের। অসুখ বিসুখ করে নানানরকম। কিন্তু সামান্য সাবধানতা নিলেই আর ভুগতে হয় না। যেমন শরতের শেষে যে হিম পড়া শুরু হবে সেটা খেয়াল রাখা জরুরী। আবার হেমন্তের শেষে যখন শীতের হাওয়ার পরশ লাগবে আমলকি গাছের ডালে ডালে, তখনও শীতকে নত মস্তকে আহ্বান জানাতে হবে প্রয়োজনীয় গরম জামা ব্যবহার করে। নইলেই বিপদ।

বিপদ অবশ্য আরও আছে। যাদের আদৌ গরম-জামা কিংবা জামা-ই নেই তাদের কথা বলছি। ঋতু পরিবর্তন তো তাদের কাছে একটা বিলাসী শব্দ মাত্র। কারণ বাঘের দাঁতের মত শীত তাদের খালি গায়ে, ছেঁড়া কাঁথায় কাটাতে হয়। পুরোনো জামা-কাপড় যত্ন করে কাচিয়ে তাদের দেওয়া যেতে পারে। গরম জামাও। তবে এটা যেন "দানের" মত না হয়—অর্থাৎ বড়লোক-গরীব সম্পর্ক যেন প্রকাশ না পায়। ভিক্ষার ভাব যেন না আসে। ভুললে চলবে না যে, আমাদের দেশটাই গরীব। কাজেই "বড়লোকী" দেখানোটা অসমীচীন। আমাদের কি ১০০/২০০ টাকা দিয়ে জুতো, জামা, ফ্রক কেনা আমাদের দেশে সাজে?

(জনসংযোগ বিভাগ, সি·এম·ডি·এ· ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস কলিকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

বেরোব। এবার সোজা থানায়। খড়ের গাদা থেকে ছুঁচ বের করতে যদি কেউ পারে তো পুলিশেই পারবে। রাস্তায় লোক-চলাচল তখন খুবই কমে এসেছে। সমুদ্রের ধার যতই নাতিশীতোষ্ণ হোক, বালির গরম বড় সাংঘাতিক। স্যাণ্ডেল-গলানো পা-জোড়া বালির কণায় কণায় ক্ষতবিক্ষত হবার যোগাড় হয়েছে। হাঁটাও তো কম হল না। ভোর থেকে শুরু হয়েছে, এখন বেলা প্রায় বারোটা।

পকেট থেকে রুমাল বার করে সান-গ্লাসের ঘামটা মোছবার জন্যে চোখ থেকে সবে সেটা খুলতে যাব, হঠাৎ স্বর্গদ্বারের কাছে বিচের ধারে রাখা একখানা মোটরের আড়াল থেকে বেরিয়ে-আসা একটি মূর্তিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম।

আরে, গীতিকা না ?

॥ তিন ॥

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে গীতিকার ? এ যে চেনাই যায় না ! মাত্র ক'টা দিন, এর মধ্যে এত পরিবর্তন ঘটতে পারে কোনো মানুষের ? পুরীতে গায়ের রঙ ময়লা হয় জানি, কিন্তু এরকম ? এত কালো ? রঙের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, চেহারা ? চেহারাও কি এত বদলে যেতে পারে ? কোথায় গেল তার সেই মেদবর্জিত শরীরের গোলাপি আভা ? এ যে সম্পূর্ণ একটা অন্য মানুষ !

সন্দেহ জাগে সত্যিই গীতিকা কি না। তাই একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম, 'গিতু !'

গীতিকার তরফ থেকে কোনা সাড়া পেলাম না।

আবার ডাকলাম, 'গিতু !'

এবারেও সেই একই ব্যাপার ঘটল। অর্থাৎ সাড়া নেই।

আবার ডাকলাম। আবার, আবার। কিন্তু গীতিকা যেমন-কে-তেমনই। যেমন এগিয়ে চলছিল, তেমনিই চলল। ধীর পায়ে। চোখদুটোর কেমন আচ্ছন্ন অবস্থা। রাত্রির নির্জনে হলে না হয় বুঝতাম নিশির ডাকে চলেছে, কিন্তু এ তো তা নয় ! এ যে ভর-দুপুর !

সত্যিই গীতিকা তো ? আবার সন্দেহ জাগল মনে। এধার-ওধার তাকালাম একবার, তারপর সরে এলাম একটু তফাতে। দুপুর নির্জন হয়ে গেছে। স্নানার্থীদের কলরোল-উচ্ছ্বাস অনেক আগেই থেমে গেছে। এখন শুধু বালির পাড়ে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। তাহলে বোধ হয় গীতিকা নয়। অন্য কেউ। গীতিকা হলে, অভ্র নাহয় নিখোঁজ, শুভ্র তো সঙ্গে থাকত। বিশেষ করে, অভ্র যখন নিখোঁজ হয়েছে, শুভ্রকে নিশ্চয়ই কাছছাড়া করবে না সে। আর, শুভ্র যখন কাছে নেই, তখন গীতিকা না হওয়াটাই স্বাভাবিক। হুবহু একই রকম চেহারা, একই রকম চালচলন, হাবভাব—দুই মায়ের দুই সন্তানের এমন দৃষ্টান্ত তো জগতে বিরল নয়।

তবু মন মানল না আমার। পিছু নিলাম মহিলার। পা টিপে টিপে, যেন টের না পান।

টের অবশ্য পেলেনও না উনি। কিন্তু আমার বিস্ময় যেন সীমা ছাড়াল যখন দেখলাম মহিলাটি রাস্তা পার হয়ে তিন ধাপ সিঁড়ি টপকে আস্তে আস্তে ঢুকলেন গিয়ে আমারই হোটেলের ডান পাশে 'সাগরবেলা'য়। এ-হোটেলটা অনেক বড়। সামনে বিরাট কম্পাউণ্ড, বাহারি গাছ লাগানো বড়-বড় টবে ঘেরা। মাঝখানে বেতের তৈরি ছোট-ছোট ছাতির নীচে বেতেরই তৈরি তিনখানা করে চেয়ার আর টিপয় গোছের কিছু। এমনি অনেকগুলো। তবে ফাঁকা। দুপুর বলেই বোধ হয় তখন লাউঞ্জে কেউ ছিল না। মহিলাটির সঙ্গে সঙ্গে আমিও লাউঞ্জ পর্যন্ত গেলাম। লাউঞ্জ পার হয়ে মহিলাটি তখন পশ্চিমমুখো সিঁড়ি

বেয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছেন। একমুহূর্ত ভাবলাম, তারপর সামনেই একজন বয়কে পেয়ে ম্যানেজারের ঘরটার খোঁজ করলাম।

আমার বক্তব্য শুনে কপালটা একটু কুঁচকোলেন ম্যানেজার, তার পর খাতা খুলে দেখে যা বললেন, তাতে তো আমি একেবারে থ। মহিলার নাম গীতিকা মুখার্জি, স্বামীর নাম সমর মুখার্জি। কলকাতা থেকে এসেছেন সঙ্গে দুই বোনপোকে নিয়ে। নাম অভ্রদীপ এবং শুভ্রদীপ চ্যাটার্জি।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বললাম, 'ওঁর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। আপনার কোনো আপত্তি আছে কী?'

'আপত্তি?' ম্যানেজার কী যেন ভাবলেন মনে হল। বললেন, 'না, ঠিক আপত্তি নয়—মানে—মানে আপনি কে বা কী ব্যাপারে দেখা করতে চান না জানলে—'

পরিচয় দিলাম। এবং দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজার চেয়ার ছেড়ে যেন লাফিয়ে উঠলেন। আমার আপাদমস্তকটা একবার ভালভাবে জরিপ করে নিলেন মনে হল। তারপর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'বেশ, দেখা করুনগে।'

টেবিলের ওপর যে পেতলের কলিং-বেলটা ছিল, সজোরে সেটা বার দুই বাজিয়ে দিলেন তিনি। একটু পরে নুলিয়ার মতো কালো এবং মাথায় ছুঁচলো-টুপি-পরা পাকা-গোঁফ ভাঙা-দাঁত একটি হোটেল-বয় খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এসে দাঁড়াতেই তাকে নির্দেশ দিলেন, 'দোতলায় তেরো নম্বর ঘরে নিয়ে যাও—।'

তেরো নম্বর ঘর! মনটা আরেক দফা ধাক্কা খেল আমার। সাহেবদের দেশে তেরো সংখ্যাটাকে অশুভ ধরা হয়। মনে পড়ল, গীতিকারা ট্রেনে উঠেছিল তেরো তারিখে। আর এখানে এসে উঠেছে যে ঘরটাতে, তার নম্বরও তেরো। অর্থাৎ দুটোই অশুভ।

দোতলায় তেরো নম্বর ঘরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে ডান হাতটা ডান পায়ের হাঁটুতে রেখে ডান দিকে হেলে তেমনি খোঁড়াতে-খোঁড়াতে হোটেল-বয়টি অদৃশ্য হয়ে গেল সমুদ্রমুখী দক্ষিণ দিকের বারান্দাটার দিকে।

দরজাটা বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিলাম, কিন্তু খুলল না। দ্বিতীয় ধাক্কা দেবার জন্যে হাত বাড়াতেই চোখে পড়ল কলিং-বেলের বোতামটা। দেখামাত্রই টিপে দিলাম সেটা এবং টেপামাত্রই দরজাটা খুলে গেল। আশ্চর্য, কোনো যান্ত্রিক কৌশল নাকি? কিন্তু যান্ত্রিক কৌশল যে সেটা নয়, বুঝলাম, যখন দেখলাম দরজার ভেতরের পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গীতিকা—বীথিকার বোন।

সম্পূর্ণ আলাদা এক মানুষ যেন। একটু আগের সেই ঘোর-ঘোর ভাব, কি নিশির ডাকে তন্ময় হয়ে চলা সেই গীতিকা এ নয়। এ গীতিকার চোখের চাউনি একেবারে সাধারণ। দাঁড়াবার ভঙ্গি, কথা বলার ধরনে এতটুকুও অস্বাভাবিকতা নেই। আমাকে দেখেই চোখ দুটো জলে ভরো-ভরো হয়ে উঠল তার। হাতের ইঙ্গিতে খাটের ওপর আমাকে বসতে বলে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'আপনি শুনেছেন সব?'

'শুনেছেন সব মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

'অভ্র আজ তিন দিন হল নিখোঁজ, আর গত পরশু থেকে শুভ্ররও কোনো সন্ধান—'

কথাটা শেষ করার সময়টুকুও পেল না গীতিকা। তার আগেই বুক-ঠেলে-ওঠা কান্নার আবেগে একেবারে ভেঙে পড়ল সে।

॥ চার ॥

রঙে না হলেও ঢঙে এরা বোনে-বোনে

দেখছি একেবারে এক। একজন আরেকজনের আয়না। দোষ করব, প্রায়শ্চিত্তও করব, তবু মতের পরিবর্তন করব না—এটাই বোধ হয় এদের স্বভাবগত ধর্ম।

গীতিকার কথা শুনে মাথাটা আমার ঘুরে গেল হঠাৎ, চোখের সামনে সবকিছু ধোঁয়া-ধোঁয়া। তার শেষ-না-করা শেষ কথাটায় আমি বোধ হয় শেষ হবার যোগাড়। তবু, পাশের আলমারির কিনারে হাতের ভর দিয়ে নিজেকে আমি যথাসম্ভব শক্ত রাখার চেষ্টা করলাম। শুধু অভ্র নয়, শুভ্রও নিখোঁজ! কী কুক্ষণেই না টিকিট কেটে ওদের ট্রেনে তুলে দিয়েছিলাম সেদিন! স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী জেনেও কেন যে বীথিকার কথায় সেদিন কান দিয়েছিলাম! এখন, এই মুহূর্তে, আমি একা, সামলাই কী করে সব? কার সঙ্গে যুক্তি করব, পরামর্শ নেব? সামনে যে, সে তো বীথিকারই বোন গীতিকা!

কয়েকটা মুহূর্ত আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরল না। সরবে কী, সারা শরীর দিয়ে তখন আমার কালঘাম ছুটছে। উত্তেজনায় মাথার চাঁদি যেন গরম লোহার চাটু হয়ে গিয়েছে! কতক্ষণ পর একসময় সামনের সোফাটায় বসে পড়ে বললাম, 'গোটা ব্যাপারটা আমায় গোড়া থেকে খুলে বলো দিকিন কী হয়েছিল না হয়েছিল!'

গীতিকা তখনো কেঁদে চলেছে সমানে। সেই অবস্থাতেই শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছতে-মুছতে আস্তে-আস্তে উঠে গিয়ে সে দরজাটা দিল বন্ধ করে। ফিরে এসে খাটের ছত্রিতে ঠেস দিয়ে বসে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সে। যেন কী বলবে, কোথা থেকে শুরু করবে, কিছুই বুঝতে পারছে না। কিংবা এমনও হতে পারে, এখানকার এই ঘটনাটা তার জীবনে এমনই এক আকস্মিক এবং অভাবিত ব্যাপার যে সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে তার। স্মৃতিবিভ্রম হলে মানুষ যেমন আস্তে আস্তে সব মনে করার চেষ্টা করে, বিড় বিড় করে বকতে বকতে অসংলগ্ন অস্ফুট উচ্চারণে ব্যক্ত করতে শুরু করে অতীত কাহিনী, গীতিকা ঠিক তেমনি ভাবেই ছাড়া ছাড়া ভাবে বলতে শুরু করল তার কথা।

আসার সময় ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে খেয়ে দেয়ে, গল্প করে, ঘুমিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই এসেছে ওরা। স্টেশন থেকে দু'খানা রিকশা ভাড়া করে, একটায় মালপত্রসমেত অভ্র, আরেকটায় তার মাসিমাকে নিয়ে শুভ্র বেশ দিব্যি এসে পৌঁছল 'সাগরবেলা'য়। সাগরবেলা হোটেলটা যে সমুদ্রতীরের ভাল হোটেল, কাগজে কাগজে এ-বিজ্ঞাপন অনেক আগেই চোখে পড়েছিল গীতিকার। তাই অন্য কোনো হোটেলের নাম না বলে সে রিকশাওলাকে স্রেফ সাগরবেলার নামই করে। রিকশাওলাও সোজা নিয়ে এসে ছেড়ে দেয় এখানে।

অভ্র ছাড়া ওরা দুজনেই খুব খুশি এমন জায়গায় এসে। অভ্র যে খুশি নয় তা নয়, তবে ছেলেবেলা থেকে প্রকৃতির চেয়ে স্থাপত্যের দিকে তার ঝোঁক বেশি। তাই সমুদ্রের ঢেউয়ের চেয়ে ওকে টানে বেশি মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প। পর পর দুদিন—একদিন ভুবনেশ্বর, আরেকদিন কোনারক—বেড়িয়ে এল সে। দুটো জায়গাতেই সে একা-একা গিয়েছিল। মাসিমার বারণ শোনেনি। বলেছিল, 'বাসে যাব, ভয় কী?' ভয়ের অবশ্য কিছুই ঘটেনি। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিল। তৃতীয় দিন সকালে উঠে সে কাগজকলম নিয়ে বসল ওড়িশার স্থাপত্যশিল্পের ওপর একটা রচনা লিখতে। মাসিমাকে ডেকে বলল, 'তোমরা আজ আমাকে বিরক্ত করবে না। চাও তো মন্দির দেখে আসতে পারো, পুজোপাঠ দিতে পারো, আমাকে বাদ দিয়ে যদি অসুবিধে না হয় তো সাক্ষিগোপালও দর্শন

করে আসতে পারো, সেই সঙ্গে নন্দন কানন। নন্দন কানন দেখে শুভ্র খুশি হবে খুব।'

গীতিকা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আপত্তি তুলেছিল। বলেছিল, 'শুভ্র—এতটুকু একটা বাচ্চাকে নিয়ে বেরোব—তুই বলছিস কী?'

'অন্যায় কিছু বলছি না। শুভ্র বাচ্চা হতে পারে, কিন্তু তুমি তো আর বাচ্চা নও মাসিমা! যাকগে, আমাকে আর বিরক্ত কোরো না, তোমরা এখন এসো গে—'

বয়সের তুলনায় অভ্রর কথাগুলো একটু পাকা—এটা জানা ছিল গীতিকার। তাই আর দ্বিরুক্তি না করে তাড়াতাড়ি প্রাতঃপর্ব মিটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শুভ্রকে সঙ্গে নিয়ে। ক'দিন হয়ে গেল সে এখানে এসেছে, কিন্তু কিছুই দেখা হয়নি এখনও পর্যন্ত। দেখার মধ্যে সমুদ্রের ধার আর হোটেলের বোর্ডার। হোটেল-কম্পাউণ্ডের বেতের ছাতির তলায় বসে চা খেতে খেতে সে শুধু তাকিয়েই থেকেছে এদিক-ওদিক। ভাল লেগেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের কথাবার্তা বুঝতে পারেনি বলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছে। কেউ গুজরাটি ভাষায় কথা বলছে, কেউ সিন্ধি, আবার কেউ বা চিনে ভাষায়। বাঙালিও যে ছিল না একেবারে তা নয়, তবে বেশির ভাগই তাদের উচ্চনাসা। দু'চারজন অবশ্য খুবই ভদ্র, হাসিখুশি চপল স্বভাবের। গীতিকাকে দেখলেই কিংবা শুভ্রর দিকে চোখ পড়লেই কফির পট হাতে নিয়ে অনেকে এগিয়ে আসেন এদিকে। অর্থাৎ গীতিকার পাশের ছাতিতে। গীতিকাও মিশুকে খুব, সমরের সঙ্গে দু-চারটে পার্টি-ফার্টিতেও গেছে, সুতরাং আদব-কায়দা কিছু যে না জানে তা নয়। নিত্য-নতুন শাড়ির ব্যবহার সে জানে, জানে রঙ মিলিয়ে কস্‌মেটিক্সের ব্যবহার, মাপা হাসি মাপা কথাও সে রপ্ত করেছে বেশ। কিন্তু করলে হবে কী, বুদ্ধিটা তো কারবাইডে পাকানো আম—বাইরে রঙ ধরা হলেও ভেতরে দরকচা-পড়া।

যাই হোক, স্নানটান সেরে শুভ্রকে সঙ্গে নিয়ে গীতিকা প্রথমেই বেরিয়ে পড়ল জগন্নাথ দর্শনে। একখানা রিকশা করে সোজা চলে গেল সে মন্দিরে। একজন পাণ্ডা নিল, তাকে সঙ্গে করে ভালভাবে চারধার ঘুরে, পুজো-আচ্চা দিয়ে ফিরল যখন, তখন বেলা প্রায় দেড়টা। হাতে একরাশ মালপত্র—রাস্তায় যেখানে যা দেখেছে, মনে ধরেছে, কিনে নিয়েছে। মোষের শিংয়ের কলমদানি, উড়ন্ত পাখি, সিগারেট পাইপ, ধূপদানি থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু। গরমে, রাস্তা হাঁটার পরিশ্রমে, খিদেয় একেবারে অবসন্ন হয়ে গিয়েছিল তারা। হোটেলে ঢুকেই প্রথমে ছুটল রান্নাঘরের দিকে। তেরো নম্বরের 'মিল' ঘরে পৌঁছে দেবার হুকুম দিতে। অভ্র ইতিমধ্যে খেয়ে নিয়েছে কি না কে জানে। ভাইকে বাদ দিয়ে, আগেভাগে সে অবশ্য খায় না কখনো, তবু একবার বয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে নিল। অভ্র খেতে আসেনি শুনে তিনটে মিলের অর্ডার দিয়ে গীতিকা ঘর্মাক্ত শরীরে দোতলায় উঠে গেল নিজের ঘরের দিকে।

কপাটটা ভেজানো। দু'হাতে জিনিসপত্র বোঝাই, তাই কাঁধের একপাশ দিয়ে পদটা সরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল গীতিকা। টেবিলের ওপর নিজের হাতের মালগুলো নামিয়ে রেখে শুভ্রর হাত থেকে এক-এক করে সব ক'টা প্যাকেট ধরে নিল। তারপর তাকে হাত-মুখ ধোবার কথা বলে ঘরের এদিক-ওদিক বাইরের বারান্দাটায় একবার ঘুরে এল, কিন্তু অভ্রকে কোথাও দেখতে পেল না। অথচ খাটের ওপর তার লেখার খাতা, কলম, ডায়েরি সবকিছু খোলামেলা পড়ে রয়েছে। হয় বাথরুমে নয় নীচে আশপাশে কোথাও গেছে মনে করে ঘেমো শাড়ি-ব্লাউজখানা পালটে নিল গীতিকা, হাত-মুখ ধুয়ে এল। ইতিমধ্যে

বারান্দার টেবিলে তিনটে মিল এনে দাঁড়িয়ে রয়েছে হোটেল-বয়।

গীতিকা কেমন চিন্তিত হয়ে উঠল। শুভ্রকে বলল, 'কিন্তু তোর দাদা কোথায় গেল বল তো? ঘর খোলা, কাগজপত্র মেলা...দেখে আয় তো বাবা একবার একতলাটা—কারো সঙ্গে গল্পে বসে গেছে কি না—।'

দৌড়ে শুভ্র নীচে নেমে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, 'না তো মাসিমা, দাদা নীচে কোথাও নেই!'

'কোথায় গেল তাহলে?' কপালে ভাঁজ পড়ল গীতিকার। ছুটে গেল দক্ষিণ দিকের বারান্দার দিকে। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখল চোখ মেলে। রাস্তা, স্বর্গদ্বারের মোড়, সি বিচ কোথাও দেখতে পেল না অভ্রকে। এই আসে এই আসে করে বসে রইল তো বসেই রইল। সময় পেরিয়ে চলল হু হু করে, দুটো থেকে তিনটে, তিনটে থেকে চারটের চৌকাঠে। নেমে গেল ম্যানেজারের ঘরে। ম্যানেজার তখন ফোন করছিলেন কাকে। কথা শেষ হলে গীতিকার দিকে তাকাতেই সে বলল সবকিছু। শুনে ম্যানেজার বললেন, 'আপনার এই বোনপোটি তো একটু খেয়ালি ধরনের। হয়তো কোথাও গেছে। ভাববেন না, এসে পড়বে'খন।'

ম্যানেজার তো বলে খালাস, কিন্তু না ভেবে গীতিকা থাকে কী করে? দাদাকে ফেলে শুভ্র খাবে না কিছুতেই, তবু জোর করে তাকে চাট্টি খাইয়ে দিয়েছে সে ইতিমধ্যে। ম্যানেজারের কাছ থেকে বেরিয়ে শুভ্রকে সঙ্গে নিয়ে গীতিকা শুরু করল ঘর-বার করা। এ-মোড়, ও-মোড়, সে-মোড়। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না অভ্রকে। ক্রমে সন্ধে হল, সমুদ্রের তীর লোকে-লোকে গিজগিজ করতে শুরু করল। রাত হল, আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে হতে একেবারে নির্জন হয়ে গেল সমুদ্রতীর, পথঘাট। ঘুমোতে না-চেয়েও একসময় বিছানায় গিয়ে পড়ল কি ঘুমোল শুভ্র।

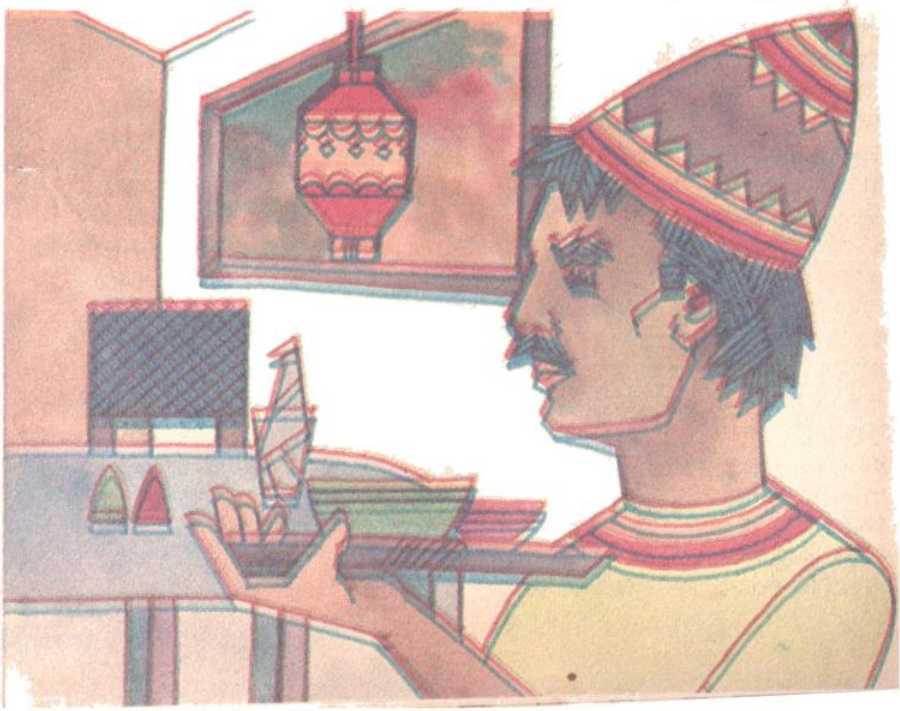

গীতিকা আবার দক্ষিণের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কী করবে এখন সে? অভ্র কোথায় গেল? ম্যানেজারের ঘরে আরেকবার গিয়েছিল সে। আরো কয়েকজনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, 'দেখুন, হয়তো ভুবনেশ্বরে গিয়ে বসে আছে। এর আগেও অনেকবার অনেক ছেলে বাবা মাকে না জানিয়ে লোকাল ট্রেনে চেপে ভুবনেশ্বর চলে গিয়েছিল। এই বয়েসটা তো শাসন না-মানা, বাঁধন না-মানার বয়েস! দেখবেন, কালই আবার ফিরে আসবে।'

কিন্তু অভ্র তো তেমন ছেলে নয়! তাহলে?

সামনে অকূল সমুদ্র তেমনি ভেঙে ভেঙে পড়ছে, গর্জন করে ছুটে আসছে বড় বড় ঢেউ। গীতিকা হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেল। মনে হল ওই ঢেউগুলো যেন তাকে গ্রাস করবার জন্যেই ছুটে আসছে। একদৌড়ে ছুটে এসে সেও আছড়ে পড়ল বিছানার ওপর, ঘুমন্ত শুভ্রকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ভেঙে পড়ল অঝোর কান্নায়।

॥ পাঁচ ॥

কাঁদতে কাঁদতে কখন যে এক সময় দু-চোখের পাতা বুজে এসেছিল, বুঝতে পারেনি গীতিকা। ঘুমটা ভাঙল কলিং-বেলের সজোর আওয়াজে। ধড়মড় করে উঠে পড়ে ঘড়ির দিকে একবার চোখটা বুলিয়ে নিল সে। সাড়ে-আটটা। গরম কাল, সুতরাং অনেকটা বেলাই হয়ে গেছে। শুভ্রও ঘুম তখনো ভাঙেনি।

তাড়াতাড়ি দরজাটা গিয়ে খুলল সে। দেখল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে সেই খোঁড়া হোটেল-বয়টি। ভোরবেলা বোর্ডারদের হুকুমমতো ডেকে দেওয়ার একটা রেওয়াজ আছে এখানে। এই হোটেল-বয়টি হয়তো

সেই কারণেই এসে বেল বাজিয়েছে। কে জানে, হয়তো এর আগেও বার কয়েক এসেছে সে, বেল বাজিয়ে গেছে, সাড়া না পেয়ে এবার তাই একটু জোরেই বেলটা টিপেছে সে।

প্রথম দিন এই হোটেল-বয়টিকে দেখে কেমন একটা মায়া হয়েছিল গীতিকার। সেটা বোধহয় ওর এই খোঁড়া হওয়ার জন্যেই। কিন্তু আজ তাকে দেখে কেমন আঁতকে উঠল সে। ডাকতে গিয়েও ডাকল না। কী এক অজ্ঞাত আশঙ্কা যেন গলাটাকে চেপে ধরল তার। সারা বারান্দাটা খাঁ-খাঁ করছে, তেরছাভাবে চড়া রোদ এসে পড়েছে ঘরের প্রায় দেয়াল পর্যন্ত। বোর্ডারদের ঘরে-ঘরে চাবি। কেউ বেরিয়েছে প্রাতঃভ্রমণে, কেউ বা ট্যুরিস্ট বাসে চেপে বেড়াতে, কেউ কেউ বা নীচের কম্পাউণ্ডে বেতের ছাতির তলায় দ্বিতীয় রাউণ্ড চা-পান করতে।

ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হতে তিনি সেই আগের মতোই নিস্পৃহ গলায় জবাব দিলেন, 'আজকের দিনটা দেখুন, তার পর না হয় কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

বলা বাহুল্য, জবাবটা ভাল লাগল না গীতিকার। ম্যানেজারের কথাবার্তার ধরনটা এমন যেন ছেলে-মেয়ের নিরুদ্দেশের ঘটনা এখানে একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা।

কাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি গীতিকার। শুভ্রও নামেমাত্র বসেছে। এখন কিছু খাওয়ার দরকার। তাই কম্পাউণ্ডে বেতের ছাতির তলায় গিয়ে বসল ওরা। হুকুম দিল খাবারের। আশপাশে এধারে-ওধারে অনেকেই বসে। সামনের ছাতিটার তলায় বসে আছেন মধ্যবয়স্কা এক বাঙালি দম্পতি। চেহারায় সম্ভ্রান্ত এবং স্বভাবে স্বল্পভাষী। সঙ্গে একটি বছর বারো-তেরোর ছেলে। স্বাস্থ্যবান, চঞ্চল এবং সপ্রতিভ। প্রতিদিন ভোরে উঠে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায় বাবা-মায়ের সঙ্গে। বাবা-মায়ের নাম জানে না, তবে ছেলেটার ডাকনাম বাবাই। তাঁদের পেছনে কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি নিয়ে যে লোকটি চোখে রঙিন চশমা এঁটে প্রায় সর্বদাই একটা খবরের কাগজের পাতায় নিমগ্ন, তাঁকে দেখলে বুকটা হঠাৎ কেমন ছ্যাঁত করে ওঠে। রঙটা যেমনই হোক, সারা মুখখানায় কী বিশ্রী একটা রুক্ষ কর্কশ ভাব। ডান দিকের চোখের কোল থেকে কান-বরাবর একটা কাটা দাগ যেন লোকটিকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। ইনি কথা বলবেন কি, এঁর কাছে কেউ ঘেঁষে বলে মনে হয় না। গীতিকা তো তাকাতেই পারে না এঁর দিকে, কেমন যেন ভয়-ভয় করে। তাঁর পাশে একটা ছাতি বাদ দিয়ে মুখে টোব্যাকো পাইপ এক প্রৌঢ়কে প্রায়-সময়ই দেখে গীতিকা। ভদ্রলোক যেমন অমায়িক তেমনি মিশুকে। একরকম যেচে যেচেই আলাপ করেন সবার সঙ্গে। কথা বলে যান ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেশের আবহাওয়া থেকে শুরু করে সাহিত্য-শিল্প-ভ্রমণ, এমনকী ঘরোয়া রান্নাবার্তা পর্যন্ত যাবতীয় কিছু। দু' দিন ওঁর সঙ্গে কথা বলে দেখেছে গীতিকা, পরকে চট করে আপন করে নেবার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের।

বয় এসে ব্রেকফাস্ট রেখে গেল টেবিলের ওপর। শুভ্রর ডিশটা ওর কোলের কাছে টেনে দিতে দিতে ভাবল গীতিকা, অভ্রর নিরুদ্দেশের খবরটা ভদ্রলোককে জানালে কেমন হয়? বয়েস হয়েছে, অনেক অভিজ্ঞতা আছে, হয়তো পথ বাতলে দিতে পারেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল ম্যানেজারের কথাটা 'আজকের দিনটা দেখুন না!' বলি-বলি করেও কিছু বলতে পারল না গীতিকা, ভদ্রলোক তার আগেই ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলে গেলেন যেন। এবং ব্যস্ত ছিলেন বলেই বোধ হয়

আজ আর এগিয়ে এলেন না, কিংবা লক্ষই করেননি তাদের।

বেলা গড়িয়ে চলে ক্রমে। হোটেলের লাউঞ্জ সরগরম হয়ে ওঠে নতুন বোর্ডারের কলরোলে, সমুদ্রস্নানে যাবার জন্যে হৈ-চৈ শুরু করে ছেলে-মেয়ে-বুড়োর দল। কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না গীতিকার, শুভ্রও সেই সঙ্গে। একবার গেটের মুখে, একবার বা রাস্তায়, আবার কোনো সময় বা সি-বিচে একটু ঘুরে আসে তারা। মন মানে না, তাই সন্ধানী দৃষ্টিটা বুলিয়ে চলে এখানে-ওখানে-সেখানে—ভিড়ের মধ্যে, ফাঁকা জায়গায়।

মানসিক দুশ্চিন্তা অনেক সময় শারীরিক ক্লান্তিও ডেকে আনে। দুপুরের খাওয়া, যদিও সে না-খাওয়ার মতোই, সেরে নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছে কত কী আকাশ-পাতাল, হঠাৎ কখন যে আবার সেই কালঘুম নেমে এসেছে চোখে, বুঝতে পারেনি গীতিকা। বুঝল যখন, তখন বিকেল উতরে সন্ধে হতে চলেছে। আকাশ মেঘে-মেঘে কালো, বাতাসে ঝোড়ো উন্মত্ততা।

ঘুমটা ভেঙে যেতেই হঠাৎ কী খেয়াল হল, হাতড়ে হাতড়ে বিছানাটা দেখে নিল গীতিকা। শুভ্র নেই—কখন একসময় উঠে গেছে। হয়তো ঘুমন্ত মাসিমাকে ডাকেনি কোনো কারণে। তবু বুকটা একবার ছ্যাঁত করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। পড়ি-কি-মরি হয়ে উঠে পড়ল সে। আলোটা জ্বালল ঘরের। ভেজানো দরজাটা খুলে বারান্দায় বেরোতে যাবে, হঠাৎ পায়ে একটা কী যেন ঠেকল মনে হল। লক্ষ করতেই দেখে, একফালি কাগজ। কাগজখানা তুলে নিয়ে আলোয় মেলে ধরতেই দেখল সেটা একখানা চিঠি।

চিঠিটা পড়তে শুরু করেছে। মাথাটা ঘুরে উঠল তার। একটু সামলে নিয়ে আবার শুরু করল, কিন্তু শেষ করা আর হল না। তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। পড়বার আগে দরজার কপাট একখানা শক্ত হাতে চেপে ধরবার চেষ্টা করেছিল, এইটুকুই শুধু মনে আছে।

॥ ছয় ॥

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, অল্প-অল্প জ্ঞান হবার পর গীতিকার মনে হল, কেউ যেন চোখে-মুখে তার জলের ঝাপটা দিচ্ছে। কাঁধের কাছে ব্লাউজটা ভিজে, বুকের কাছে শাড়ির কাছটাও। আস্তে আস্তে পাশ ফিরতেই দেখল, নুলিয়ার মতো কালো সেই হোটেল-বয়টি হাতে একটা মগ-মতন কী নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ডাকবে, এমন ক্ষমতা তখন ছিল না গীতিকার, কিংবা সেরকম জ্ঞান তখনো তার ফেরেনি।

গীতিকাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই চিঠিখানা কোথায় ? কী লেখা ছিল তাতে ?'

কোনো জবাব না দিয়ে আলমারিটা খুলল গীতিকা। কাপড়ের তলা থেকে বার করল চার-ভাঁজ-করা একখানা ছোট্ট চিরকুট। একরকম ছোঁ মেরেই সেখানা কেড়ে নিলাম তার হাত থেকে। তারপর ভাঁজ খুলে পড়তে পড়তে আমারও মনে হল যেন কাগজের লেখাগুলো চোখের সামনে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই নাচতে শুরু করেছে। তবু জোর করে মন শক্ত করে চোখ বুলিয়ে নিলাম চিঠিখানায়। লেখা ছিল

প্রথমেই বলে রাখি, এই চিঠির কথা কেউ যেন না জানে, কেউ না শোনে। কথার খেলাপ করলে ক্ষতি আপনার অনিবার্য, জানবেন। আপনার বোনপো শুভ্রকে একটা নিরাপদ স্থানেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা চাই না, তার প্রাণ-সংশয় ঘটুক। অবশ্য যদি তার বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি খরচ করেন। ভাববার

জন্যে একটা রাত সময় আপনাকে দিচ্ছি। কোথায় কীভাবে টাকাটা দিতে হবে—আগামীকাল জানাব। এ-চিঠি অনুযায়ী না চললে আপনার বোনপোর কান দুটো আপনার কাছে উপহার পাঠানো হবে। আর, কথাটা যদি পুলিশের কানে ওঠে, তাহলে তার মৃতদেহটাও।

চিঠিখানার তলায় নাম স্বাক্ষর কিছু ছিল না, ছিল শুধু একটি শব্দ—'মুক্তিদূত'।

চিঠিখানা পড়ে থমকে গেলাম কিছুক্ষণের জন্যে। আজকাল খবরের কাগজের পাতা খুললে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেলে ফিরিয়ে দেওয়ার এই ধরনের ঘটনার কথা প্রায়ই দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা অবশ্য জানা যায় না। তবে পণ যারা আদায় করে, তারা আগেভাগে অনেক খবরই সংগ্রহ করে। মক্কেল শাঁসালো কি না—না-জেনে তারা কাজে নামে না। কিন্তু গীতিকার ক্ষেত্রে এটা কী করে সম্ভব? সে থাকে রাঁচিতে, এসেছে কলকাতায় তার দিদির কাছে বেড়াতে, সেখান থেকে ক'দিনের জন্যে পুরীতে সমুদ্র-দর্শনে। তার আর্থিক অবস্থা ভাল কি মন্দ, মুক্তিপণ দেওয়ার মতো টাকা তার আছে কি নেই—জানবে কী করে এই মুক্তিদূত সম্প্রদায়? কাছেপিঠে বেড়াতে বেরিয়ে কেউ হাজার হাজার টাকা, বিশেষ করে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, সঙ্গে নেয় না নিশ্চয়ই তাহলে?

চিঠিতে শুধুমাত্র শুভ্রর নামই উল্লেখ আছে—অভ্রর নয়। তাহলে অভ্র গেল কোথায়? সত্যিই কি ভুবনেশ্বরে গেছে? কিন্তু মাসিমাকে না জানিয়ে যাওয়ার কারণটা কী?

আমাকে পেয়ে গীতিকা তখন তার হৃত বল ফিরে পেয়েছে যেন। চিঠিটা পড়ার সময়টুকু সে আমাকে দিল, তারপর গড়-গড় করে যেমন বলে চলেছিল তেমনিই আবার

বলে চলল তার কাহিনী। জ্ঞান ফেরার পরও অনেকক্ষণ সে উঠতে পারেনি মেঝে থেকে। কেউ যেন তার শরীরের সমস্ত শক্তিটাকে কেড়ে নিয়েছে। তারপর এক সময় যখন উঠল, উঠে বারান্দা দিয়ে একতলায় তাকাল, দেখল নীচে তখন চারদিকে ব্যস্ততার লক্ষণ। অর্থাৎ বোর্ডারদের রাতের আহারের সময় হয়েছে। তার মানে ঘড়িতে তখন ন'টা।

কী করবে, ভেবে পেল না গীতিকা। ম্যানেজারকে জানাবে? চিঠিখানা দেখাবে? কিন্তু কাউকে জানানোর পরিণামের যে আভাস চিঠিতে দেওয়া আছে, মনে পড়তেই সারা দেহটা তার কাঁটা দিয়ে উঠল। অবসন্ন শরীর নিয়ে পায়ে পায়ে একসময় সে নীচে নেমে এল। একবার ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগোল, কিন্তু বলতে গিয়েও পিছিয়ে এল সেখান থেকে। এগিয়ে চলল কম্পাউণ্ডের দিকে। নানা রঙের আলোয়, নানা রঙের পোশাকে বেতের ছাতির তলা তখনো সরগরম। কেউ কফি খাচ্ছে, কেউ গল্প করছে, কেউ বা চুপচাপ বসে। রঙিন চশমা চোখে সেই বীভৎসদর্শন লোকটি একখানা ছবির বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন, হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তেই উঠে পড়লেন। সেই প্রৌঢ় মিশুকে ভদ্রলোকটিকেও একটা ছাতির তলায় দেখতে পেল গীতিকা। আরেকজনের সঙ্গে গল্পে মত্ত।

আবার সেই পায়চারি, থেমে থেমে সন্ধানী দৃষ্টি বুলোনো, ম্যানেজারের কথা চিন্তা করা,আজকের দিনটা দেখুন না! কিন্তু আজকের দিন তো শেষ হয়ে গেল। মাঝ থেকে নতুন একটা বিপদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কী করবে সে এখন? কী করবে? কোথায় পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা? আর পেলেই বা দেবে কেন? এ কি মগের মুলুক নাকি?

অবশেষে আবার সেই ঘরে ফেরা। ক্লান্ত বিমর্ষ, বিষণ্ণ মন, সারা শরীরে রাজ্যের অবসাদ। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে জানলার কাঁচের ফ্রেমগুলো এঁটে দিল। সমুদ্রের গর্জন, মানুষের গলার আওয়াজ, রেকর্ড প্লেয়ারের গান—আজ আর কোনোটাই ভাল লাগছে না তার। এখন সে একটু অন্ধকারে থাকতে চায়, চায় চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকতে। এ বিপদ থেকে ত্রাণ পেতে হলে চাই পুলিশের সাহায্য। কিন্তু পুলিশের কাছে যাওয়া মানেই শুভ্রর মৃত্যু ডেকে আনা। এমন শাঁখের করাতেও মানুষ পড়ে!

ঘরের জোর-আলোটা নিবিয়ে মিটমিটে বাতিটা সবে জ্বালাতে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠল গীতিকা। কলিং-বেলটা বেজে উঠল না? জোর-আলোটা আবার জ্বালিয়ে, দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে। হোটেলেরই একজন বয় দাঁড়িয়ে। গীতিকার দিকে একখানা কাগজ এগিয়ে ধরে বললে, 'এটা আপনার।'

বুকটা আবার ধড়াস করে উঠল। হাতদুটো থরথর করে কাঁপতে থাকল। আবার কোন্ পরোয়ানা এল? তবু সেই কাঁপা হাতেই কাগজখানা খুলে দেখল সে। এবং দেখেই চমকে উঠল। কাগজখানার সঙ্গে পিন দিয়ে আঁটা একখানা ফোটো। মুখখানা যেন চেনা-চেনা ঠেকছে! একটু ভাবল গীতিকা। হ্যা, এই তো সেই ভদ্রলোক, মুখে ধূমায়িত পাইপ—ছাতির তলায় যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গীতিকার, মিশুকে সদাহাস্যময় সেই প্রৌঢ়। ফোটোর তলায় বাংলা টাইপ করা ক'টা কথা :

মনে হচ্ছে আপনি খুব বিপদগ্রস্ত। যদি তাই হয়, তাহলে প্রতুল লাহিড়ীর সাহায্য নিন। বিপদে তিনি আপনাকে রক্ষা করবেন ঠিকই।

প্রতুল লাহিড়ী! গীতা আর অঞ্জলি যাঁর নাম বলতে অজ্ঞান, প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

হাতে যেন চাঁদ পেল গীতিকা। মুহূর্তেই কেমন যেন হাল্‌কা-হাল্‌কা মনে হল নিজেকে। দ্রুত পায়ে দরজা খুলে আবার বেরিয়ে গেল সে। হোটেল-বয়টি তখন বারান্দা পার হয়ে সিড়ির মুখে পৌঁছেছে। দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল সে। একটু অপেক্ষা করতে বলে, একখানা ছোট্ট স্লিপে লিখল অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হোটেলের সামনে সমুদ্রের ধারে আমি যাচ্ছি। দয়া করে অপেক্ষা করবেন।.

কাগজখানা ভাঁজ করে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললে, 'যিনি চিঠিখানা দিয়েছেন, তাঁকে গিয়ে দিবি।'

একখানা দু'টাকার নোটও ছেলেটির হাতে গুঁজে দিল গীতিকা।

॥ সাত ॥

প্রতুল লাহিড়ীর নামটা শুনে আমারও চমকাবার কথা, কিন্তু তাঁর রহস্যজনক গতিবিধি এবং ক্ষেত্র-বিশেষে এইরকম হঠাৎ-উদয়ের কথা আমার জানা আছে বলেই আমি চমকালাম না। বরং আশ্বস্ত হলাম খুব। এখানে আসার সময় জেনেই এসেছিলাম তিনি কটকে এসেছেন। হয়তো সেখানকার কাজ শেষ করে ফিরে যাবার আগে একবার পুরীর সমুদ্রতীরটা বেড়িয়ে যাচ্ছেন।

না থেমে গীতিকা তেমনি বলে চলেছে তার কাহিনী। পাঁচ মিনিটও বোধ হয় লাগেনি, স্লিপারজোড়া পায়ে গলিয়ে হোটেলের সামনে সমুদ্রতীরে গিয়ে সে পৌঁছল। রাস্তার কোল ঘেঁষে আধো-অন্ধকার একটা জায়গায় টোব্যাকো পাইপ মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রতুল লাহিড়ী। গীতিকাকে দেখে মুখে সহানুভূতির হাসি ফুটে উঠল তাঁর। বললেন, 'চলুন, ওধারটায় গিয়ে একটু বসি। বসে বসে শুনব আপনার কথা।'

চলতে চলতে গীতিকা জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আপনি বুঝলেন কী করে যে আমি বিপদে পড়েছি।'

স্মিত হাসি হেসে প্রতুল লাহিড়ী বললেন, 'মুখ যে মনের দর্পণ। সেখানে যে সবকিছু ফুটে ওঠে।'

গভীর শ্রদ্ধায় যেন মাথা নত হয়ে গেল গীতিকার। ঘটনাটা আনুপূর্বিক সে বলে গেল ধীরে ধীরে। শুনে, খানিকটা গুম হয়ে রইলেন প্রতুল লাহিড়ী। তারপর বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, প্রথম ঘটনাটার সঙ্গে দ্বিতীয়টার কোনো যোগ নেই। অভ্রদীপ হয়তো সত্যিই কোথাও—তা সে ভুবনেশ্বরেই হোক, কি অন্য কোনো জায়গায়ই হোক—বেড়াতে গেছে। পাছে আপনি বাধা দেন, তাই সে—'

'কিন্তু আমি এখন কী করব, বলুন?' ভারী গলায় গীতিকা বলল।

প্রতুল লাহিড়ী বললেন, 'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, অবশ্য যদি পুলিশে খবর না দেন।'

'যদি তারা শুভ্রকে না ছাড়ে? যদি তাকে সুস্থ, অক্ষত দেহে ফিরে না পাই?' গীতিকার গলা আরো ভারী হয়ে উঠল।

গলায় জোর দিয়ে প্রতুল লাহিড়ী বললেন, 'ফিরে পাবেন ঠিকই—অক্ষত দেহেই ফিরে পাবেন। তবে কথা হচ্ছে, টাকাটা না দিয়ে পারা যায় কি না। মুক্তিদূতের চিঠিখানা পেলেন কী করে? আনল কে?'

'জানি না কে এনেছে, তবে আমি পেয়েছি আমার ঘরের দরজার গোড়ায়। পড়ে ছিল।'

'তাহলে এবার থেকে সেদিকটায় একটু নজর রাখতে হবে। যদি তেমন কারো সাক্ষাৎ মেলে, পিছু নিতে হবে। কিন্তু ছেলে হারিয়ে যাওয়ার কী কৈফিয়ত দিচ্ছেন আপনি?'

'ভাবিনি সে-কথা।'

'কিন্তু ভাবতে তো হবে।' একটু কী যেন ভেবে নিলেন প্রতুল লাহিড়ী, তারপর বললেন, 'ছেলে হারানো নিয়ে একটু হৈচৈ করুন না কেন? খোঁজার দলও তো বেরিয়ে পড়তে পারে।'

ভয়-জড়ানো গলায় গীতিকা বলল, 'কিন্তু চিঠিতে যে লেখা আছে—'

বাধা দিয়ে প্রতুল লাহিড়ী বললেন, 'ভয় নেই, চিঠির কথা যতক্ষণ না আপনি প্রকাশ করছেন, ততক্ষণ মুক্তিদূত কিছুই করবে না জানবেন। হাজার হলেও আপনি মাসিমা, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন বোনপোকে, উবে গেল হঠাৎ আর আপনি চুপ করে রইলেন—এটা হয় নাকি?'

গীতিকার গলায় যেন দিশেহারার ভাব। 'আমার মাথায় এখন কিছুই আসছে না। আমি আপনার ওপরই সব ভার ছেড়ে দিলাম।'

ইতিমধ্যে ঘণ্টা-দেড়েক সময় পার হয়ে গেছে। সমুদ্রতীর থেকে ওরা যখন ফিরে এল, হোটেলের বেশিরভাগ বোর্ডারই তখন যে-যার বিছানায়। কম্পাউণ্ডের বড় আলোগুলো নিবে গেছে, নীচের বারান্দা ওপরের বারান্দাও ফাঁকা। বারান্দার মিটমিটে আলোয় ঘরের তালা খুলছে গীতিকা, এমন সময় দক্ষিণ দিকের অন্ধকার বারান্দা থেকে বেরিয়ে এলের রঙিন চশমা পরা বীভৎসদর্শন সেই লোকটি। আস্তে আস্তে গিয়ে ঢুকলেন নিজের ঘরে।

প্রতুল লাহিড়ী একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে নিলেন তাঁর দিকে। তারপর গীতিকাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'চেনেন এই লোকটিকে?'

'চিনি বললে ভুল হবে। নামটাই যা শুনেছি—রুপেন চৌধুরী। এগারো নম্বর রুমে থাকেন। একসময় মিলিটারিতে ছিলেন, এখন রিটায়ার্ড।'

'রুপেন চৌধুরী! রুপেন চৌধুরী!' বিড়-বিড় করে নামটা উচ্চারণ করতে করতে একসময় প্রতুল লাহিড়ী বললেন, 'ভারী অহংকারী লোক। হোটেলের কারো সঙ্গে মেশেন না, এমনকী কথা বলেন না পর্যন্ত—' পরক্ষণেই ঠোঁট থেকে টোব্যাকো পাইপটা নামিয়ে বললেন, 'যাকগে, এবার আপনি নিশ্চিন্তে ঘরে ঢুকতে পারেন, আমি চলি।'

ঘুম সে-রাত্রে এলই না গীতিকার। এত দুঃখের মধ্যেও—আনন্দে কী? প্রতুল লাহিড়ীকে যেন ঈশ্বরপ্রেরিত বলে মনে হল তার। সারাটা রাত তাঁর কথা ভেবে ভেবেই কেটে গেল। গীতা আর অঞ্জলির মুখে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর দুঃসাহসের কথা বহুবার শুনেছে সে। কিন্তু চোখে দেখা এই প্রথম। এবং দেখে যা ধারণা হয়েছে, এ বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার যদি কেউ করতে পারেন তো তিনিই পারবেন। আগে শুভ্র ফিরুক, তারপর ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে আসে ভালই, নইলে তাঁকে দিয়েই অভ্রর অনুসন্ধান চালাতে হবে। এবং তিনি যদি মনে করেন, করবেন, তাহলে করবেনই।

এইরকম কত কি ভাবনা আর কল্পনা। অভ্র আর শুভ্রর মুখদুটো কেবলই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে গীতিকার। অভ্র কি সত্যিই ভুবনেশ্বর গেছে? শুভ্র এখন কোথায়, কী খাচ্ছে, কান্নাকাটি করছে কি না—এমনি শতেক চিন্তা। চিন্তা নয়, দুশ্চিন্তা।

চোখদুটো স্বতই ভরে ওঠে জলে। ঘড়ির কাঁটা সবক'টা সংখ্যা ডিঙিয়ে যায়, প্রতিটি টিক-টিক, প্রতিটি ঢং-ঢং নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে বড় বেশি করে শব্দ তোলে, মনের মধ্যে শূন্যতার হাহাকার জাগায়। ভোরের দিকে তন্দ্রার একটু ঘোর লেগেছে, চোখে, হঠাৎ খস্‌খস্ একটা আওয়াজে সেটা টুটে যায়।

বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল গীতিকা। আলোটা না জ্বেলেই দরজার কাছে ছুটে গেল সে চট করে। দ্রুত হাতে

GJA: 1154 Ben

ফুল যেমন ওঠে ফুটে অপূর্ব সৌন্দর্য্যে ভরিয়ে, আপনার রঙের বাহারও তেমনি ধীরে ধীরে উঠবে ফুটে, সৌন্দর্য্যের চমক লাগিয়ে!

আপনার সৌন্দর্য্যে চমক জাগান, স্বাভাবিক উপায়ে — ল্যাক্টো-ক্যালামাইন দিয়ে। আপনার রঙ, উজ্জ্বল দীপ্তিময় ও নিখুঁত ক'রে তোলার জন্যেই এটির প্রয়োজন। ঔষধিযুক্ত ক্যালামাইন আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে, ত্বকের যত্ন নেয় — এর ময়েশ্চারাইজার রাখে ত্বককে শিশির-কোমল ও তরতাজা করে — আর এর অ্যাস্ট্রিজেন্ট, মুখের ত্বককে টানো টানো শোভাময় ও প্রাণবন্ত ক'রে রাখে। তাই তো, আপনার মত শোভাময়ী সুন্দরীরা, বছরের পর বছর ধরে ল্যাক্টো-ক্যালামাইনএর ওপরই ভরসা ক'রে থাকেন।

তিনটি সাইজে পাওয়া যায়।

CROOKES
Lacto-Calamine
ক্যালামাইন • ময়েশ্চারাইজার • অ্যাস্ট্রিজেন্ট
রঙের বাহার সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে

হঠাৎ-খোলার মতো দরজাটা হাট করে খুলে ফেলল। বাইরে বেরিয়ে এদিক-ওদিক চাইল। বারান্দার মিটমিটে আলোয় ভাল করে দেখল, কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই! ভোর-রাত্রের হোটেল-বাড়ি শান্ত হয়েই ঘুমোচ্ছে। শুধু জেগে আছে রাস্তার ওপারে সেই সমুদ্র আর তার অশান্ত গর্জন।

আবার ঘরে ফিরে এল গীতিকা। দরজার কাছ-বরাবর এসেছে, বারান্দার আবছা আলোয় চোখ পড়ল মেঝের ওপর। সেই কাগজ একখানা! নিশ্চয়ই মুক্তিদূতের চিঠি। বিস্মিত গীতিকার হাতদুটো কেঁপে উঠল ফের। নিচু হয়ে কাগজখানা তুলে নিল সে ঠিকই, আবার একবার মিঃ লাহিড়ীর নির্দেশমতো সন্ধানী দৃষ্টিটা বুলিয়েও নিল বাইরে, কিন্তু হাত-কাঁপা তার থামল না। বরং বেড়েই চলল। হাত থেকে পায়ে, পা থেকে বুকে।

সেই অবস্থাতেই ঘরের আলোটা জ্বালল সে। যা ভেবেছে তাই—মুক্তিদূতেরই চিঠি!

আলমারির তাক থেকে দ্বিতীয় চিঠিখানাও বার করে আনল গীতিকা। একই হস্তাক্ষরে লেখা

> আশা করি ভাবনা আপনার শেষ হয়েছে। টাকাটা আমার চাই-ই। জানি, নগদে অত টাকা আপনার কাছে নেই; কিন্তু যেটা আছে, সেটা হলেই চলবে। অর্থাৎ হিরের যে হারছড়া সঙ্গে এনেছেন, সেটা দিলেই আমার চলবে। হয়তো দামটা ওর পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি, কিন্তু নগদ আপনি পাবেন কোথায়? আগামী কাল বেলা বারোটায় স্বর্গদ্বারের কাছে একখানা লাল ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন। তার চালকের আসনে কালোর ওপর হলদে-ডোরা জামা পরে যে লোকটি থাকবে, হারগাছাটা তার হাতে দিলেই চলবে। মনে রাখবেন, আপনি একা আসবেন। আপনার গলার হার আপনার হাত দিয়েই পেতে চাই। ভয় নেই, বোনপো আপনার এখনও বেশ সুস্থই আছে। তবে বেচাল যদি কিছু করেন, তাহলে সুস্থ থাকবে না। হয় কাটা কান, না হয় নিষ্প্রাণ—কিছু একটা হবেই। —মুক্তিদূত

॥ আট ॥

একবার নয়, বারবার চিঠিখানা পড়লাম। বিশেষ করে যে-জায়গাটায় হিরের হারগাছাটা সঙ্গে থাকার উল্লেখ আছে। আর, যতবারই পড়তে থাকি, ধাপে-ধাপে ততবারই যেন রক্ত আমার মাথায় চড়তে থাকে। বোনে-বোনে এরা কি সব এক? গয়না পরার লোভ কি এরা সামলাতে পারে না কোনোমতেই? একা এইভাবে চলাফেরা করবে বিদেশ-বিভুঁইয়ে, এমনিতেই বিপদ পদে পদে, তার ওপর সোনাদানা যতখানি পারবে গায়ে মুড়োবে! ধন্যি এদের দুঃসাহস!

একটুক্ষণের জন্যে গুম হয়ে রইলাম। তারপর চিঠিখানা ফিরিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি সেই হার—বিয়ের প্রথম বার্ষিকীতে যেটা সমর তোকে দিয়েছিল?'

বিবর্ণ মুখে গীতিকা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, এখনও ধার শোধ হয়নি স্যাকরার।'

'কিন্তু ট্রেনে তুলে দিতে আসার সময় তোর গলায় ওটা তো দেখিনি? কোথায় রেখেছিলি?'

ভয়-শুকনো-মুখে গীতিকা বলল, 'পেট-কাপড়ে বেঁধে রেখেছিলাম।'

'ওখানে রাখলি তো জানল কী করে মুক্তিদূত? এখানে এসে পরেছিলি একবারও?'

'পরেছিলাম, প্রথম দিন। তারপর অভ্র বলাতে খুলে রেখেছি। কিন্তু বুঝব কী করে যে, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই মুক্তিদূতের

নজরে পড়বে সেটা ?'

'আর বুঝতে হবে না—তোরা অনেক বুঝে ফেলেছিস !' ধমকের সুরে বলে উঠলাম, 'তারপর কী হল তাই বল ! চিঠিখানা পেয়ে কী করলি ?'

"চিঠিখানা পেয়েই ছুটে গেলাম প্রতুলবাবুর ঘরে। একতলায় ম্যানেজারের কাছাকাছি সিঁড়ির ধারে তিন নম্বর রুমে। তিনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন, ডাকতেই বেরিয়ে এলেন। চিঠিখানা পড়লেন ; পড়ে আপনারই মতো ধমকে উঠলেন। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমার তখন আর ধৈর্য নেই। বারবার যতবারই জিজ্ঞেস করি, তিনি কোনো জবাব দেন না। একবার ঘরে ঢুকলেন, তামাকের পাইপটা এনে ধরালেন, আবার শুরু করলেন পায়চারি। চারবারের বার জিজ্ঞেস করতেই ভীষণ রেগে গেলেন তিনি। বলতে গেলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়েই বলে উঠলেন, 'এতই যদি তাড়া তো আমার কাছে এলেন কেন ? যান, অমন দামি হারটা গিয়ে গচ্চা দিয়ে আসুন !" আমি চুপ করে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। সত্যিই তো, আমারই দোষ !

"মিঃ লাহিড়ী কিন্তু থামলেন না। দাঁত দিয়ে পাইপটা চেপে ধরে, হাত দুখানা পেছনে রেখে বারান্দাটার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত তেমনি পায়চারি করতেই লাগলেন। ম্যানেজারের ঘরের কোলে খোঁড়া হোটেল-বয়টি দোমড়ানো পা নিয়ে গুঁড়িসুড়ি মেরে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে। হোটেল তখনও জাগেনি, সুতরাং সেও অগাধে ঘুমিয়ে। কী করব, আমি একবার মিঃ লাহিড়ীর দিকে তাকাই, আবার মুখটা সরিয়ে নিই তাঁর থেকে। রাগে কি না কে জানে, সারা মুখখানা তখন তাঁর থমথম করছে। দোতলায় চোখ ফেরাতেই দেখি, এগারো নম্বরের সেই রুপেন চৌধুরী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে রঙিন চশমা থাকায় বুঝতে পারলাম না দৃষ্টিটা তাঁর কোন্ দিকে।

"কতক্ষণ পর একসময় পায়চারি থামিয়ে মিস্টার লাহিড়ী কতকটা আপন মনেই যেন বললেন, "ভুললেই হল ? একজনের ধাপ্পাবাজিতে এভাবে ভোলার কোনো মানে হয় ?" পরক্ষণেই ঘরের ভেতর ঢুকলেন তিনি, আমাকে ইশারায় ডেকে নিচুগলায় বললেন, "একটা কাজ করা যেতে পারে। শাস্ত্র-মতে যাকে বলে শঠে শাঠ্যং—"

"জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাতেই তিনি আবার বললেন, "মন্দিরের কাছে আমার এক জহুরি বন্ধু আছে। নকল হিরের কারবারি সে। যদি আপনার হারের আসল হিরেগুলো বদলে নকল বসিয়ে দেওয়া যায়— ।"

"কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই—যদি আমার শুভ্রর কোন ক্ষতি হয় তাতে ?"

'আমাকে থামিয়ে দিয়ে মিস্টার লাহিড়ী বলে উঠলেন, "মুক্তিদূত তা বুঝবে কী করে ? হারছড়াটা চাওয়া আর পাওয়ার মাঝখানে যে কৌশলটা অবলম্বন করা হল, তা তো তার কোনোমতেই বোঝবার কথা নয়।"

"মনে ধরল মিস্টার লাহিড়ীর কথাটা। বুদ্ধিটা সত্যিই খুব প্রখর ভদ্রলোকের। গীতা আর অঞ্জলি এই জন্যেই বোধ হয় তাঁর এত ভক্ত। অবশেষে আমি বললাম, "আমি আপনার ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়েছি। আপনি যা ভাল বোঝেন—"

'আমার কথা শেষ হবার আগেই মিস্টার লাহিড়ী বললেন, "জহুরি পট্টনায়কের ফোন আছে, আর এই সময়ে তাকে পাবও। আমি ম্যানেজারকে বলে একটা ফোন করছি ওঁর ঘর থেকে। আপনি শুধু নজর রাখবেন যেন ধারে-কাছে কেউ না আসে। জানেন তো দেওয়ালেরও কান আছে ?"

'এই সময় স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে বাবাইকে দেখা গেল ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে বেরোতে। বোধ হয় দৌড়তে যাচ্ছে।

ম্যানেজারকেও দেখলাম ওপর থেকে নেমে আসছেন একহাতে ব্রাশ আর অপর হাতে চাবির রিং নিয়ে। মিস্টার লাহিড়ী তাঁর সঙ্গে দেখা করে কী বললেন, তারপর তিনি চাবিটা খুলে দিতেই মিস্টার লাহিড়ী ঘরে ঢুকে গেলেন ফোন করতে। আমি রইলাম ঘরের বাইরে—যাতে কেউ নজর না করে। দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে ম্যানেজার পাশের বাথরুমটায় ঢুকতে যাবেন, এই সময় এগারো নম্বরের রুপেন চৌধুরী একখানা ছড়ি হাতে নেমে এলেন নীচে। তাঁর পেছন পেছন একজন গুজরাটি আর সিন্ধি ভদ্রলোক। তার মানে হোটেল তখন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। সূর্যোদয় দেখার জন্যেই বোধ হয় তাঁরা বেরিয়ে পড়ছেন হনহন করে। বেড-টির অপেক্ষা করতে গেলে সূর্যোদয় ফসকে যাবে।

'একটু পরেই মিস্টার লাহিড়ী বেরিয়ে এলেন বাইরে। তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "জহুরি পট্টনায়ক আসবে দুপুরে, আপনি তৈরি থাকবেন।"

'দুপুরে পট্টনায়ক এলেন। একখানা হাতব্যাগে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে হোটেল তখন ঝিমোচ্ছে। মিস্টার লাহিড়ীর ঘরে বসে দরজা ভেজিয়ে শুরু হল কাজ। পাছে কারো দৃষ্টিতে পড়ে যাই, সেই ভয়ে আমি মিস্টার লাহিড়ীকে বললাম, "আমি আমার ঘরে আছি, আপনি মিস্টার পট্টনায়কের সঙ্গে থাকুন।"

'মিস্টার লাহিড়ী আশ্চর্য হয়ে বললেন, "আপনার ব্যাপার, আপনি থাকবেন না—তা কি হয় নাকি?" পরক্ষণেই কৌতুকের সুরে বলে উঠলেন, "ধরুন যদি শেষ পর্যন্ত আমিই হারটা—"

"রক্ষক হয়ে যদি ভক্ষক হন তো হবেন। একজনের হাতে তো যেতই, না হয় বুঝব আরেকজনের হাতে গেল।'

'মিস্টার লাহিড়ী হো-হো করে হেসে উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন।

'ঘণ্টা দুই-তিন পরে আমার ঘরে এসে তিনি হাজির হলেন। ছোট্ট একটা ব্যাগ খুলে হারছড়াটা বের করে আমার সামনে খাটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে, ভেলভেটের মোড়কে রাখা কুচো হিরেগুলো পাশে রেখে বললেন, "দেখুন তো, কোনটা আসল আর কোনটা নকল?"

'পট্টনায়কের হাতের কাজ সত্যিই প্রশংসা করবার মতো। বার বার ধরে মিলিয়েও আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম না হারের হিরেগুলো আসল কি নকল।

"মিস্টার লাহিড়ী আবার বললেন, "এবার আপনার কাজ আপনি করুন—মুক্তিদূতের নির্দেশ মেনে চলুন—"

'আমতা-আমতা করে আমি বললাম, "কিন্তু আমার যে বড় ভয় করছে মিস্টার লাহিড়ী। এটা নিয়ে আপনি যদি—।" "না আমি একটু আড়ালে থাকতে চাই। মনে নেই, মুক্তিদূত কী নির্দেশ দিয়েছে আপনাকে? যদি কারো কানে তোলেন কথাটা, তাহলে—।" "থাক, আর বলতে হবে না, বুঝেছি!"

'সহানুভূতির সুরে মিস্টার লাহিড়ী বললেন, "কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, যতক্ষণ আমি আছি, আপনার বোনপোর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতে দেব না। এরপর, ভগবান না করুন, অভ্রর যদি কিছু একটা অঘটন ঘটে থাকে, যদি সত্যিই সে ভুবনেশ্বর বা আর কোথাও না গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে উদ্ধার করবার জন্যেও আমার স্টেজের আড়ালে থাকা প্রয়োজন।"

'মিস্টার লাহিড়ী ঘর থেকে চলে গেলেন। সারাটা বিকেল, সন্ধে, রাত, আজ সকালটাও আমার কাটল কী বিশ্রীভাবে! সময় যত কাছে এগিয়ে আসে, দুর্ভাবনাটা তত বাড়ে। সুস্থ অক্ষত দেহে শুভ্রকে ফিরে পাব তো? অভ্র কি সত্যিই কোথাও গেছে, নাকি মুক্তিদূতের খপ্পরে পড়েছে?

বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে দাঁতকে সারাজীবন সুরক্ষা দিন।

বিনাকা ফ্লোরাইড-এ সবচেয়ে প্রভাবশালী ফ্লোরাইড কম্পাউণ্ড থাকে। যা আসলে দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে আপনার দাঁত আরও মজবুত করে। সারাজীবন দন্তছিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে ঐ সুরক্ষা-ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়। সবসময় বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়েই দাঁত মাজুন। এটি আপনি যত বেশী ব্যবহার করবেন, আপনার দাঁতের আয়ুও তত বেশী বাড়বে।

বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে,
দন্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে।

বিনাকা ফ্লোরাইড

ভারতের সর্বপ্রথম ও প্রভাবশালী ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ULKA-BF-1-82 BN.

হারছড়াটা হাতে পাবার পর যদি তার জন্যেও আবার টাকা দাবি করে বসে ? যদি—যদি—

'আর ভাবতে পারছিলাম না—মাথা যেন টলটল করছিল। বারোটা বাজবার মিনিট-দশেক আগে বেরোলাম হোটেল থেকে। পা যেন আর চলে না। পায়ের তলায় বালি তেতে গেছে, মাথার ওপর জুন মাসের সূর্য। তার ওপর খাওয়া-দাওয়া নেই। তবু কী করব, প্রাণের দায়ে এগোতেই হল। স্বর্গদ্বারের মোড়ে লাল ফিয়াটখানা চোখে পড়ল। চালকের আসনে সেই কালোর ওপর হলদে-ডোরা জামা-পরা লোকটা। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ডান হাতখানা জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিল সে। অর্থাৎ পাওনাটা চাইছে। বুকটা দুপ-দুপ করছে তখন আমার। হাত দুটো কাঁপছে। সেই কাঁপা হাতেই ব্লাউজের ভেতর থেকে কাগজের মোড়কে রাখা হারছড়াটা বার করে তুলে দিলাম তার হাতে। মোড়কটা আমার হাত থেকে নিয়ে কঠিন গলায় লোকটা বলল,"মুখ বুজে সোজা ফিরে যান হোটেলে। ঠিক দু-ঘণ্টা বাদে ছেলে ফিরে পাবেন আপনি—অবশ্য হিরেগুলো যদি খাঁটি হয় !"

'কথাটা শুনে, কী বলব জামাইবাবু, মনে হল যেন শিরদাঁড়ায় আমার কে যেন বরফ চেপে ধরল !'

॥ নয় ॥

এতক্ষণে বুঝলাম, সমুদ্রতীর থেকে হোটেলে আসার পথে কেন আমায় গীতিকা চিনতে পারেনি। কেন নিশি-ডাকা মানুষের মতো ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে বালির ওপর চটি ঘষতে ঘষতে সে হোটেলে এসে ঢুকল। ফিয়াট গাড়ির চালকের আসনে-বসা লোকটির কথা শুনলে যে কোনো মানুষেরই বোধ হয় ওইরকম অবস্থা হত। হিরেগুলো যে মুক্তিদূত যাচিয়ে নিতে পারে—এ সন্দেহ গীতিকা প্রথমেই করেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, ভুল সে কিছু করেনি। কিন্তু প্রতুল লাহিড়ী ! তিনি কী করে এ ভুল করলেন ? নাকি এর মধ্যে অন্য কোনো মতলব আছে তাঁর ? তিনদিন পার হয়েছে অভ্র নিখোঁজ হয়েছে। আর পাঁচজন বাড়ি-পালানো ছেলের মতো সেও হয়তো ভুবনেশ্বর কি অন্য কোথাও পালিয়েছে—ম্যানেজারের এই ধারণার সঙ্গে হয়তো তাঁর ধারণা মেলেনি। তাই মনে মনে তিনি অন্য কিছু একটা কৌশল এঁটেছেন, যাতে শুভ্রর সঙ্গে অভ্রকেও উদ্ধার করা যায় একই সময়ে। প্রতুল লাহিড়ীর সঙ্গে দীর্ঘকাল আমি পরিচিত, তবু তাঁর চিন্তাধারার নাগাল আমি আজও পেলাম না। তবে একটা বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত যে, নাটকে প্রতুল লাহিড়ীর প্রবেশ যখন ঘটেছে, তখন রহস্যের আবরণ উন্মোচন হবেই।

বারান্দার ঘড়িতে ঢং করে একটা আওয়াজ হতেই হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। আড়াইটে বাজে। ফেরার হলে, শুভ্রর ফিরতে আর আধ ঘণ্টা বাকি।

অস্থির গলায় গীতিকা বলে উঠল, 'কী হবে জামাইবাবু ? আমি তো আর কিছু ভাবতে পারছি না—আপনি যাহয় একটা কিছু বলুন বা করুন !' গালের ওপর চোখের জলের শুকনো দাগগুলো আবার ভিজে উঠল তার।

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'মিস্টার লাহিড়ী এখন কোথায় ?'

'বলতে পারব না। সকালে চায়ের টেবিলে তাঁকে শেষ দেখেছিলাম। এখন, আসবার সময় দেখলাম, ঘরে তালা ঝুলছে।'

'প্রতুল লাহিড়ীর ঘরের তালা ঝুলতেই থাকবে—আর কোনোদিনই খুলবে না !'

অপরিচিত গম্ভীর গলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে ঘরের আধ-ভেজানো

দরজাটা খুলে যেতেই গীতিকা যেন ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল হঠাৎ। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি মুখ ফেরাতেই দেখি, রঙিন চশমা-চোখে বীভৎসদর্শন দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে ঢুকছেন। চোখের কোল থেকে কান-বরাবর কাটা দাগটা তাঁর হাসিটাকে যেন প্রচণ্ডভাবে বিকৃত করে তুলেছে।

সোফা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে-না-উঠতেই লোকটি রঙিন চশমার আড়ালে বোধ হয় একবার আমাকে দেখে নিলেন। তারপর গীতিকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা ইনি—ইনি কে ?'

আমি সঙ্গে আছি, সুতরাং ভয়ের বদলে গীতিকার গলা এবার বেশ সাহসীই শোনাল, 'ইনি যেই হোন, আপনার জেনে লাভ কী ? আপনি কে ? এখানে কেন ? কী মতলবে আমার ঘরে ঢুকেছেন ? ভেবেছেন, আমি একা আছি, না ?'

'থাক থাক, অনেক হয়েছে, আর নয়। এতগুলো প্রশ্নের জবাব দেওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং—'

জিভ দিয়ে তালুতে বিচিত্র একটা শব্দ করে উঠলেন ভদ্রলোক, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন হোটেলের ম্যানেজার, তাঁর সঙ্গে ডান হাতটা ডান পায়ের হাঁটুতে রেখে, ডান দিকে হেলে যথারীতি খোঁড়াতে-খোঁড়াতে নুলিয়ার মতো কালো এবং মাথায় ছুঁচলো টুপিপরা পাকা-গোঁফ ভাঙা-দাঁত সেই হোটেল-বয়টি। পেছন পেছন বছর বারো-তেরোর চঞ্চল সপ্রতিভ একটি ছেলে আর বোধহয় তার বাবা-মা। সবার পেছনে শুকনো-মুখ উসকো-খুশকো-চুল শুভ্রকে সঙ্গে নিয়ে দুজন পুলিশ অফিসার।

শুভ্রর দিকে চোখ পড়ামাত্রই যাকে বলে হামলে গিয়ে পড়া—গীতিকা তাই করে বসল। বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে হেসে-কেঁদে একেবারে অস্থির হয়ে উঠল সে। তার দিকে তাকিয়ে খোঁড়া হোটেল-বয়টি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'শুভ্রই তোমার সব—আমি বুঝি কেউ নই মাসিমা ?'

শুভ্রকে বুকের ওপর চেপে রেখেই পেছন ফিরল গীতিকা। অবাক বিস্ময়ে একবার হোটেল-বয়টির খোঁড়া পায়ের দিকে, একবার তার মুখের দিকে ফ্যালফেলিয়ে চাইতেই মাথা থেকে নুলিয়ার টুপি আর নাকের তলা থেকে নকল পাকা গোঁফের ঝোরাটা খুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হোটেল-বয়টি বলল, 'এবার দেখো তো চিনতে পারো কিনা !'

'অভ্র !'

কাকে ফেলে কাকে ধরবে, বুঝতে পারে না গীতিকা। আনন্দে যেন লাফাই-ঝাঁপাই শুরু করে দিল সে। একবার এধার, একবার ওধার। শেষে দুজনকে দু'হাতে টেনে নিয়ে যেন আদরে আদরে পিষে ফেলতে চাইল।

সমস্ত ঘটনাটা এমনই নাটকীয় এবং অভাবিত যে,আমি তো তখন তাজ্জব হয়ে গেছি বলতে গেলে। এগারো নম্বর রুমের বোর্ডারটি হঠাৎ দানব থেকে দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে গেলেন যেন। চোখে রঙিন চশমা নেই, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি নেই, চোখ থেকে কান-বরাবর কাটা দাগটা পর্যন্ত মুছে গেছে। কঠিন-কর্কশ মুখখানাও প্রসন্ন হাসিতে ভরা। পকেট থেকে ওক কাঠের টোব্যাকো পাইপটা বার করে ঠোঁটে লাগাতেই স্বতই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'মিস্টার প্রতুল লাহিড়ী !'

আমার সঙ্গে সঙ্গে গীতিকার মুখ দিয়েও একটা অব্যক্ত ধ্বনি বেরিয়ে এল, 'অ্যাঁ !'

কাগজের মোড়ক একটা গীতিকার দিকে এগিয়ে ধরে মিঃ লাহিড়ী বললেন, 'দেখো তো মা, এই মোড়কটা তোমার কি না। হিরেগুলো কিন্তু সব আসল, আমার মতো নকল নয়।'

'তার মানে ?' চোখ বড় বড় করে

বলে উঠলাম কথাটা।

'হ্যাঁ।' মিঃ লাহিড়ী বললেন, 'চালাকিটা মুক্তিদূত এখানেই করেছিল। জহুরি পট্টনায়ককে দিয়ে নকল হিরে বসানোর নাম করে সে আসলগুলোই রেখে দিয়েছিল হারের মধ্যে।'

সঙ্গে সঙ্গে গীতিকা কী-একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে হোটেলের ম্যানেজার বলে উঠলেন, 'ছেলে-বুড়ো-বাচ্চা—সকাল থেকে কারোরই কিছু খাওয়া হয়নি এখনও। আগে চলুন, খেয়ে নেবেন, তারপর যত ইচ্ছে, যা ইচ্ছে জানতে চান, জানবেন।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সপ্রতিভ চঞ্চল ছেলেটির একখানা হাত ধরে আমার কাছে টেনে নিয়ে এল অভ্র। বলল, 'বাবা, এর সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই—এসো আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম সুনন্দ বাগচী, আমার নতুন গোয়েন্দা বন্ধু। খুব ভাল দৌড়তে পারে। সত্যি বলতে কী—'

'উঁহু উঁহু, এখন নয়—,' বাধা দিলেন মিঃ লাহিড়ী, 'খাওয়া-দাওয়ার পর—'

॥ দশ ॥

গল্পটার শুরু অভ্রর নিখোঁজ নিয়ে, শেষ তাকে ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এই হারানো-প্রাপ্তির মধ্যেকার সময়টায় একের পর এক যে ঘটনাগুলো ঘটল, যে মানুষগুলো এল আর গেল, তার পেছনে যে রহস্য দানা বেঁধে রয়েছে, পেট যতই চুঁই-চুঁই করুক, সেটা জানার কৌতূহলও যেমন দমন করতে পারছিল না কেউ, জানানোর আগ্রহও তেমনি চেপে রাখতে পারছিলেন না মিঃ লাহিড়ী। তাই খাবার টেবিলে বসে মাঝপথেই তিনি শুরু করে দিলেন তাঁর কথা। বললেন, 'ইদানীং জালিয়াতের একটা দল জালিয়াতির একটা নতুন পথ আবিষ্কার করেছিল। সেটা হল, বড় বড় শহরের ভিড় থেকে ছেলে কি মেয়ে চুরি করে তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা। পণটা নগদে না পেলে, অলঙ্কারে হলেও তাদের চলত। প্রথমে মুক্তিদূতের জবানিতে ভয়-দেখানো একখানা চিঠি, তারপর সে-চিঠির গ্রাহকদের সামনে শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে হাজির হওয়া এবং একসময় কাজ হাসিল করে সরে পড়া। গ্রাহক না বলে গ্রাহিকা বলাই বোধ হয় ভাল। কারণ পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই এদের শিকার হত বেশি। জালিয়াতের এই দলটা ভ্রাম্যমাণ যাত্রাদলের মতো আজ এখানে কাল ওখানে—বিশেষ করে হোটেলপ্রধান শহরেই পালা গেয়ে বেড়াত। দলের পাণ্ডার কাজ ছিল হোটেলে-হোটেলে নজর রাখা—কার টাকা আছে, কার গয়না আছে, কে একটু বোকা টাইপের, কে দুর্বল প্রকৃতির —ইত্যাদি খুঁজে বার করা এবং যথাযথভাবে তাকে শিকার করা। ক'দিন আগে শুনলাম, দলটি নাকি সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের পালা শেষ করে পুরীতে এসে আসন গেড়েছে আর দলের পাণ্ডাটি শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে নাম নিয়েছে প্রতুল লাহিড়ীর। এখানকার পুলিশ-অফিসার মিস্টার নিত্যানন্দ মহাপাত্র এবং বৃন্দাবন পারিজা আমার বহুদিনের বন্ধু। তাঁদের কাছ থেকে ট্রাঙ্ককল পেয়ে আমি চলে আসি এখানে। কলকাতা থেকে আসার সময় অবশ্য কাজের সুবিধের জন্যে বলে এসেছিলাম কটকে যাচ্ছি। যাই হোক, এখানে এসে পুরনো নামকরা কোনো হোটেলে না উঠে উঠলাম, এই হোটেলটায় রুপেন চৌধুরী নাম নিয়ে। কারণ আমার ধারণা, পুরনো হোটেলের চেয়ে নতুন হোটেলেই এই সব ক্রিমিন্যালদের কাজ-কারবারের সুবিধে হয় বেশি। ক'দিন কড়া নজর রাখলাম হোটেলের বোর্ডারদের ওপর, এমনকী আমার বন্ধু বৃন্দাবন পারিজার সাহায্যে পাশাপাশি আরো কয়েকটা হোটেলে। শেষে একদিন দেখা

মিলল নকল প্রতুল লাহিড়ীর, শুনলাম এই হোটেলের তিন নম্বর রুমে এসে উঠেছেন।'

মাছের কাঁটা বাছতে-বাছতে একটু থামলেন মিঃ লাহিড়ী। তারপর একসময় ফের শুরু করলেন, 'হঠাৎ ক'দিন আগে দোতলার বারান্দা দিয়ে দেখি, সাইকেল-রিক্‌শা চেপে এই হোটেলের সামনে নামল আমাদের অভ্রদীপ আর শুভ্রদীপ। সঙ্গের মহিলাটি, মুখ দেখেই মনে হল, ওদের মাসিমা। আমি তখন রুপেন চৌধুরী, সুতরাং আমাকে চিনতে পারার কথা নয় ওদের, চিনলও না। আমিই একদিন সুযোগ বুঝে গোপনে অভ্রদীপকে ডাকলাম এবং পরামর্শ করে তাদের মাসিমাকে বেড়াতে পাঠিয়ে, তার ভোল পালটে দিলাম একেবারে। আমার ইনফর্মারের কাজে তাকে লাগিয়ে দিলাম। অবশ্য ম্যানেজারকে অনেক আগেই আমি হাত করেছিলাম। টেলিফোনের কথাবার্তা, বোর্ডারদের প্রত্যেকের গতিবিধি, অতিথি-অভ্যাগতদের দিকে লক্ষ রাখাই ছিল অভ্রের প্রধান কাজ। বলা বাহুল্য, সে-কাজে সে খুব ভালভাবেই উতরে গেছে।'

ভালভাবে উতরে যে গেছে, সে তো বুঝতেই পারছি। মাসিমা না হয় দূরে থাকে, তার চলা-বলার সঙ্গে কতটুকুই বা পরিচিত, কিন্তু আমি যে আমি—তার বাবা, আজন্ম প্রতিক্ষণের সঙ্গী, সেই আমিও কিনা বোকা বনে গেলাম। অবশ্য মুখটা অভ্র সর্বদাই আড়াল করে রেখেছিল চোখের সামনে থেকে, খুঁড়িয়ে হেঁটে চলার ভঙ্গিটাকেও ফেলেছিল সম্পূর্ণ পালটে, গলার স্বরটা শুনেছি কি না খেয়াল নেই যদিও—নিশ্চয়ই বদলেছিল, তবু বাপ হয়ে আমার একটু সন্দেহ করাও অন্তত উচিত ছিল।

'কিন্তু মুক্তিদূতকে আপনি ধরলেন কী ভাবে মিস্টার লাহিড়ী?' খাওয়া থামিয়ে চোখ বড়-বড় করে গীতিকা প্রশ্ন করল।

মিঃ লাহিড়ী বলে চললেন, 'একদিন ঘন্টা-দুয়েকের জন্যে যদি হারটা গলায় না ঝোলাতে, তাহলে আর এই এত বড় ঘটনাটা অন্তত তোমার বেলায় ঘটত না। আমার মতো, নকল প্রতুল লাহিড়ীর চোখেও সেটা পড়েছিল। ঘন ঘন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ, টেলিফোনে জহুরি পট্টনায়ককে নেমন্তন্ন করে আনা, তার সঙ্গে ঘরে বসে কথাবার্তা—সবই আমার নজরে পড়েছিল। বুঝতে আমার বাকি রইল না যে, তুমিই এবার তার শিকার হয়ে গেছ। জহুরি পট্টনায়ক যে নকল হিরের কারবারি—সেটা আমার জানা ছিল। সুতরাং দুই আর দুইয়ে চার যোগ করতে আমার অসুবিধে হল না। অবশ্য এর পেছনে আমার কৃতিত্ব যতখানি, অভ্র এবং তার নতুন বন্ধু সুনন্দর কৃতিত্ব তার চেয়ে কম নয়। টেলিফোনে কথাবার্তা আদানপ্রদানের খবর সংগ্রহে অভ্রর দান যতটা, সমুদ্রের তীর থেকে 'চক্রতীর্থ' পর্যন্ত মোটরের পেছনে অনুসরণ করে মুক্তিদূতের আসল ঘাঁটির হদিস বের করে আনায় সুনন্দর ক্রেডিটও ঠিক ততটাই। গত পরশু বিকেলের দিকে সমুদ্রের ধারে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সুনন্দর নজরে পড়ে, একজনের সঙ্গে শুভ্র একটা মোটরে উঠছে। তার কেমন সন্দেহ হয়। গাড়িটার গতি লক্ষ করে সে ছুটতে শুরু করে। প্রথমে অনেকটা আগে আগেই ছিল, কিন্তু পরে পিছিয়ে পড়ে। পিছিয়ে পড়লেও গাড়িটার গন্তব্যে সে পৌঁছেছিল ঠিকই। স্টেশন থেকে চক্রতীর্থের পথটা যেখানে প্রথম বাঁক নিয়েছে, তারই ধারে একখানা পোড়ো বাড়িতে শুভ্রকে কোলে নিয়ে গাড়ির চালককে ঢুকতে দেখে সে। চুপি চুপি জায়গাটা দেখে এসে সুনন্দ জানায় আমাকে। পারলে, পুলিশ নিয়ে গিয়ে সেদিনই উদ্ধার করে আনতে পারতাম শুভ্রকে, কিন্তু তাতে দলটা হয়তো ধরা পড়ত না।'

মাসিমাকে তার দিকে তাকাতে দেখেই শুভ্র বোধহয় বুঝে ফেলল প্রশ্নটা। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বিকেলের দিকে তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে। নীচে গিয়ে রাস্তায় পায়চারি করছি, এমন সময় একখানা মোটরগাড়ি থেকে নেমে এল একজন লোক। এসেই জিজ্ঞেস করলে আমার নাম শুভ্র কি না। আমি মাথা নাড়তেই লোকটা বললে, তোমার দাদার একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, হাসপাতালে আছে, তোমাকে নিয়ে যেতে বললে। মাসিমাকে খবরটা দেবার কথা তুলতেই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বললে, এখন নয়, দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেই তিনি জানতে পারবেন সব। এখন খবর দিলে কান্নাকাটি করবেন, আর কান্নাকাটি করলে হাসপাতালে ঢুকতেই দেবে না। দাদার চিন্তায় আমিও তখন এত অস্থির যে কোনোদিক না ভেবে সোজা গিয়ে উঠলাম গাড়িতে। গাড়িতে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা একটা রুমাল চেপে ধরল আমার নাকের কাছে। এরপর আর আমার কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি একটা ভাঙা ঘরের তক্তপোশে পড়ে আছি।'

'তোকে তো বুদ্ধিমান বলেই জানতাম।' অভ্র সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তুইও স্রেফ একটা লোকের কথায় ভুলে গেলি সব! একবার ভাবলি না—'

'ভাবব কী, তার আগেই তো রুমালের গন্ধে আমি অজ্ঞান। আর জানিস তো, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিলে যেমন বুদ্ধি বাড়ে, তেমনি নাকে ক্লোরোফর্মের গন্ধ গেলে বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়?'

ফিয়াট গাড়ির চালকের প্রসঙ্গ বর্ণনা করে গীতিকা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মিস্টার লাহিড়ী, মুক্তিদূতের সাগরেদ হঠাৎ এ-কথাটা কেন তুলল যে, হিরেগুলো যদি খাঁটি হয়?'

মৃদু হাসলেন মিঃ লাহিড়ী। তিনি জবাব দেবার আগেই অভ্র বলে উঠল, 'এটা আর বুঝলে না মাসিমা? তোমার মনে ভয় ঢুকিয়ে আর কিছুক্ষণ তোমাকে নির্জীব করে রাখার জন্যে। নির্বিঘ্নে কাজ গুছিয়ে সরে পড়তে হলে কিছু সময়ের তো দরকার!'

একটা কথা জানার জন্যে অনেকক্ষণ থেকেই আমার মনটা ছটফট করছিল ভেতরে ভেতরে। সুনন্দর দিকে ফিরে তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তুমি আমায় টেলিগ্রাম করে আনালেই বা কেন, আর আনালেই যদি তো সি-সাইটের ঠিকানায় কেন?'

এবারও জবাবটা দিল অভ্র। বলল, 'আমারই নির্দেশে। তোমাকে আনানোর আসল উদ্দেশ্য, আমার ছদ্মবেশটা তুমি ধরতে পারো কি না, সেটা দেখা। আর, সি-সাইটের ঠিকানা দেওয়া এই কারণে যে, পাছে তুমি এই হোটেলে উঠেই আমার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে একটা হৈ-চৈ ফেলে দাও, আর মুক্তিদূতের সেটা নজরে পড়ে যায়। তাহলেই তো আমার প্ল্যান সব ভেস্তে যাবে। আমি জানতাম, তুমি আসবে, চারদিকে খোঁজখবর করবে, থানায় যাবে—এতে যা সময় লাগবে, তার মধ্যে আমাদের সব কাজ হাসিল হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত খোঁজখবর নিতে তুমি যে এই হোটেলে আসবেই, তাও আমার জানা ছিল।'

মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস বাগচীর দিকে তাকিয়ে মিঃ লাহিড়ী বললেন, 'আপনারা ছেলেটার দিকে একটু নজর দিন, দেখবেন বড় হয়ে ও একজন নামকরা দৌড়বীর হবে।'

'আর আমি?' আগ বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি অভ্র বলে উঠল, 'আমি কী হব?'

'একজন বড় অভিনেতা। স্কুলে গো অ্যাজ ইউ লাইক-এ নাম দিয়েছ কখনো?'

ছবি জয়ন্ত ঘোষ

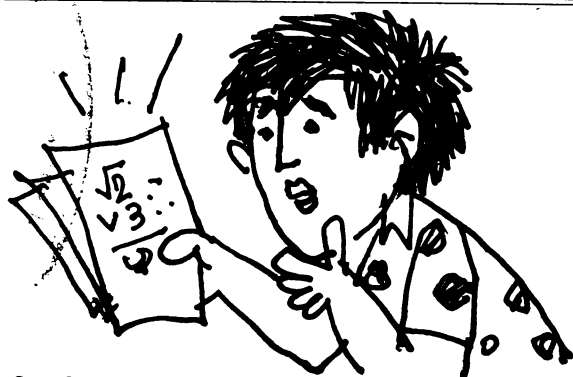

হোমটাস্ক দিয়ে গিয়েছিল ছোট্‌কা। একটা ভাগের অঙ্ক ভুল করেছিলাম। আর তাইতেই যত দুর্গতি আমার।

ছোট্‌কার প্রশ্নের পর প্রশ্ন। ভাগ-অঙ্ক ঠিক হয়েছে কিনা, কীভাবে তা মেলাতে হয়, ভাজ্য কাকে বলে, ভাজক কী, ভাজক ও ভাগফল গুণ করে তার সঙ্গে ভাগশেষ যোগ করে কেন দেখিনি যে, অঙ্কটা ঠিক হয়েছে কিনা—এইসব হাজার প্রশ্ন। শুধু কি এখানেই শেষ ? না। এরপরও পনেরোটা ভাগের অঙ্ক করে ছোট্‌কাকে দেখাও।

দোষটা অবশ্য আমার নিজেরই। কেন যে উত্তরটা মিলিয়ে দেখিনি আগেভাগে। এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ভাজক কাকে বলে, ভাজ্য কী ? যারা জানো না, তাদের জন্য বলে দিই। ভাজক মানে, যা দিয়ে ভাগ করা হয়। আর ভাজ্য হল, যাকে ভাগ করা হয়। ভাজক ও ভাগফল গুণ করে তার সঙ্গে ভাগশেষ (যদি কিছু থাকে) যোগ করলে ভাজ্য সংখ্যাটা যদি পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে ভাগ ঠিক হয়েছে।

এত কথা বললাম কেন বলো তো ? না না, মাস্টারি করার জন্য নয়, এমনকী, নিজের জ্ঞান ঝালিয়ে নেবার জন্যও নয়, আসলে এবারের ধাঁধাটাও একটা ভাগ-অঙ্ক মেলানো নিয়ে কিনা, তাই।

ভাগে ভুল করেছিলাম বলেই ছোট্‌কা এবার ধাঁধাও দিয়েছে ভাগ নিয়ে।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটি ছেলে পরীক্ষার ভাগ-অঙ্কে দেখল, ভাগফল হয়েছে ৫৭, ভাগশেষ থাকছে ৫২।

ভাজক ও ভাগফল গুণ করে তার সঙ্গে ভাগশেষ যোগ করে অঙ্কটা মেলাতে গেল ছেলেটি। উত্তর হল ১৭৩৮০। ভাজ্য সংখ্যাটা মিলল না। আবার প্রথম থেকে দেখল। ধরা পড়ল যে, আসল গণ্ডগোলটা সে অন্য জায়গায় করেছে। অঙ্কটার উত্তর মেলাবার সময় ছেলেটি ভাজকের মধ্যের অঙ্কটা ভুল তুলেছিল। ৬-এর জায়গায় শূন্য ধরেছে সে। আর তাই ধরেই গুণ করে ভাগশেষ যোগ করেছে সে।

এ থেকে বলতে পারো, আসল ভাগ-অঙ্কটা কী ছিল ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ বন্ধনীর মধ্যে এমন শব্দ বসাও যাতে বাইরের বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মিশে একটা অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হয়, ডানদিকের বাইরের শব্দের প্রথমে যোগ করলে আরেকটি অর্থপূর্ণ শব্দ হয়—

পরি (—) গত

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

ন ন্দী জ ব র

গতবারের উত্তর ॥ (১) গীতা চৌধুরী, পরমা বসু, লতিকা হোম, চন্দ্রা ভদ্র, মঞ্জু সেন, অঞ্জু পাল, স্বপ্না মজুমদার। (২) উপ(বীত)রাগ। (৩) বিজয়াদশমী।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

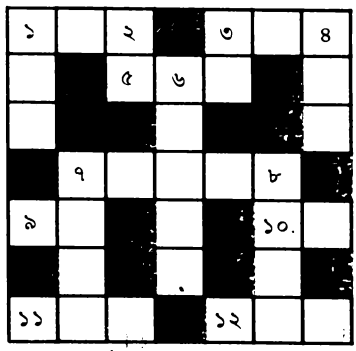

সংকেত পাশাপাশি (১) শুকনো ফল, যা থেকে মালা হয়। (৩) পক্ষিবিশেষ। (৫) রাঁধুনি। (৭) কাঁচা মটর। (৯) ফলবিশেষ, নানা জাতের হয়। (১০) কামরা। (১১) বিষ। (১২) থাকে যদি ডাইনে-বামে, বসা যাবে কী আরামে!

উপর-নীচ (১) রক্ত। (২) রাত্রি। (৩) যে-কোনো চক্রাকার বস্তু। (৪) বর্ম। (৬) বনভোজন। (৭) পাখিবিশেষ। (৮) সরীসৃপ প্রাণিবিশেষ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

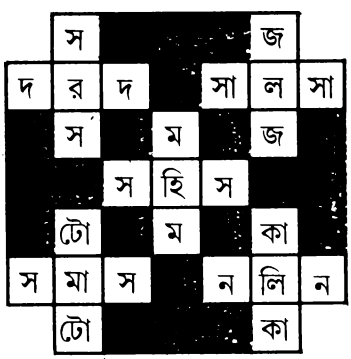

মজার খেলা

এ খেলার জন্য চাই ক্যারামের দশটা ঘুঁটি। পাঁচটা সাদা আর পাঁচটা কালো।

নীচের ছবির মতন টেবিলের ওপর দশটা ঘুঁটিকে সাজাও। সাদা, কালো, সাদা, কালো—এইভাবে। পরপর।

এবার খেলাটা শোনো। দুটো ঘুঁটিকে সরিয়ে অন্যত্র ফাঁকা জায়গায় বসাতে হবে একেক দানে। ঘুঁটিদুটো যে-অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই অন্যত্র বসাবে। অর্থাৎ সাদা-কালো অবস্থায় তুললে বসাবার সময় কালো-সাদা করে বসানো যাবে না। এইভাবে পাঁচ দানে পাঁচটা কালো একদিকে, পাঁচটা সাদা অন্য দিকে নিয়ে আসতে হবে। তাহলেই এ খেলায় জয়ী বলে ধরা হবে।

শুনতে সহজ। কিন্তু এলোপাতাড়ি চালে এ-খেলা হবার নয়। আগে একবার আটটা ঘুঁটি দিয়ে এমন খেলা শিখেছ। সেই বুদ্ধি দিয়েই এগোতে হবে।

আমি একটা সমাধান দেখিয়ে দিচ্ছি—

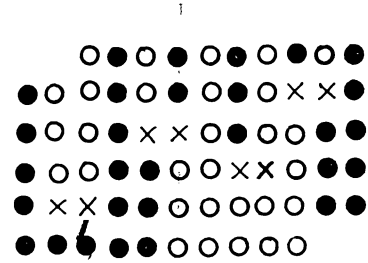

মজারু

কিসের ফোটো

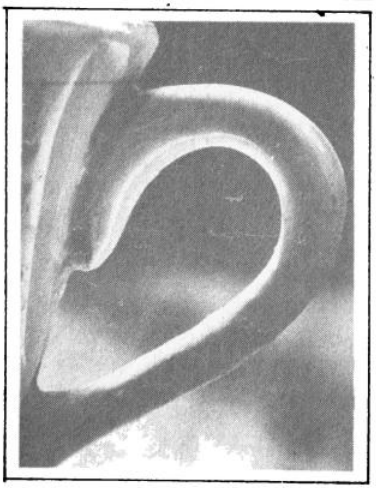

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ক্যামেরার লেন্সের ফোটো
ফোটো তপন দাশ

উত্তর বঁটে

প্রঃ ভিক্ষে করে খাও কেন ? এই কাঠ কখানা চিরে দিলেই তো আমার বাসায় এক বেলা খেতে পাবে।

উঃ খাবার মেনুটা আগে দেখি ?

প্রঃ আপনাকে কিছুদিন আয়রন খেতে হবে যে ?

উঃ কী করে খাব ডাক্তারবাবু, আমার যে দাঁত নেই।

প্রঃ ভগবান দুটো কান দিয়েছেন কী জন্যে, একটা কানেও তো দিব্যি শোনা যায় ?

উঃ দুটো কান না থাকলে চশমা পরতাম কী করে !

প্রঃ ৫০ বছর আগে কেন বলা হত সূর্য কখনো ব্রিটিশ পতাকা থেকে অস্ত যায় না ?

উঃ নিশ্চয়ই পতাকাগুলো সূর্যাস্তের আগেই ঘরে তুলে ফেলা হত।

সুসেন

হাসিখুশি

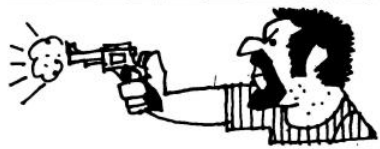

"হি কিল্ড এ ম্যান—এটা কোন্ কেস পাপান ?"

"মার্ডার কেস স্যার।"

"আমি যা বললাম, তা থেকে তুমি কী বুঝলে পাপান ?"

"বুঝলাম, আপনি যখন কথা বলেন, তখন আপনার ওপরের চোয়ালটাই নড়ে, নীচেরটা নড়ে না।"

"আপনার বাড়ির দরজায় 'কুকুর হইতে সাবধান' বোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছেন দেখছি। কিন্তু বাড়িতে তো কোনো কুকুর দেখছি না ?"

"বোর্ডটা ঝুলিয়েছি বাইরের কুকুর থেকে বাড়ির লোকজনদের সাবধান হওয়ার জন্য।"

"রমেশবাবু, আপনি সেদিন বলছিলেন কয়েক লক্ষ বছর আগে আমরা বাঁদর ছিলাম। আপনিও কি ওই তালিকায় আছেন ?"

"আপনি যে এখনও ওই তালিকায় জায়গা পাননি, ব্যাপারটা জানাতেই আপনাকে কথাটা বলেছিলাম।"

ছবি দেবাশিস দেব

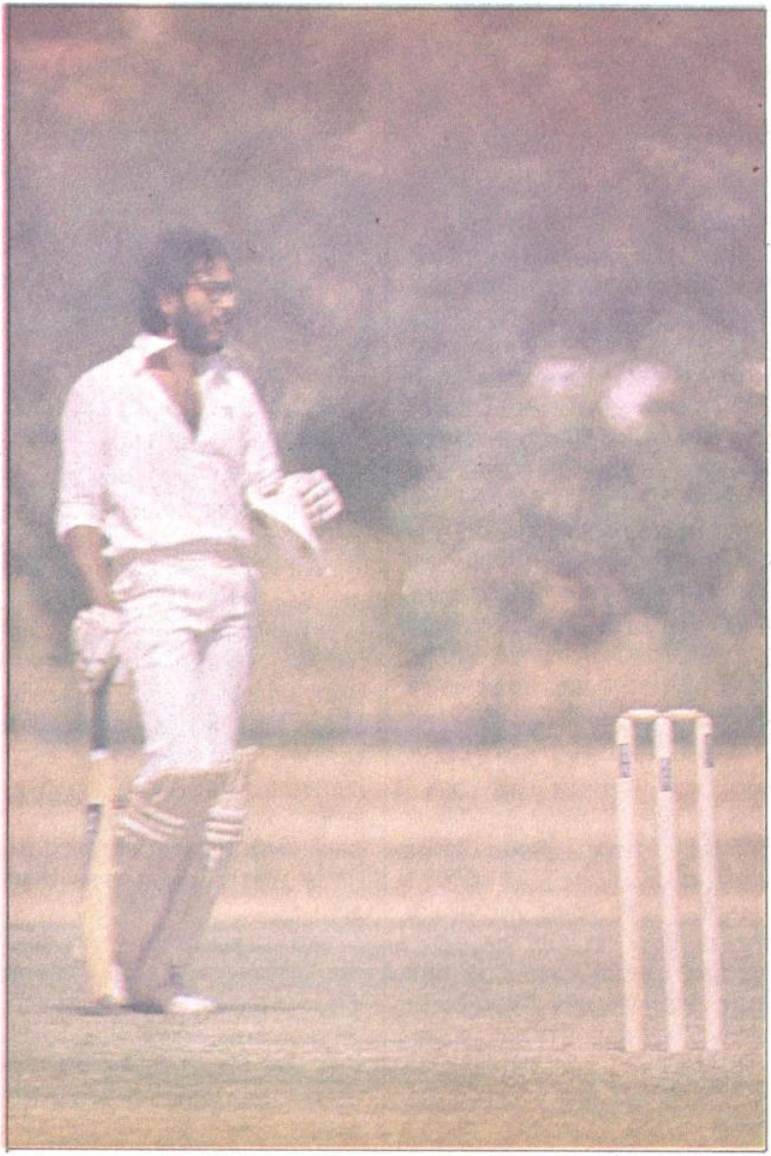

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

অংশুমান (জলন্ধরে ডাবল সেঞ্চুরি)

(পাতা ওলটালেই ক্রিকেটের খবর)

টু-হান্‌ড্রেড ক্লাব

অশোক রায়

এ-কথা খুবই সত্যি জলন্ধরে অনুষ্ঠিত পাক-ভারত দ্বিতীয় টেস্টটি আদৌ জমেনি। প্রথমত বৃষ্টি, দ্বিতীয়ত দু-দলের ক্রিকেটারদের নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ মুছে দিয়েছিল ক্রিকেটের যাবতীয় চার্মটুকু। তবে ভারতের পক্ষে এই টেস্টের একমাত্র সান্ত্বনা অংশুমান গায়কোয়াড়ের প্রথম ডবল সেঞ্চুরি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম দ্বি-শত রানের ইনিংসটি গড়ার ফাঁকে গায়কোয়াড় ভেঙেছেন চান্দু বোরদের ১৭৭ রানের নজিরটি।

গায়কোয়াড়ের আগে ভারতের পক্ষে ডবল সেঞ্চুরির নজির ছিল দশটি। এর মধ্যে সানি গাওসকরের ঝুলিতেই রয়েছে সর্বাধিক তিনটি। ভিনু মাঁকড় এবং দিলীপ সারদেশাইয়ের দুটি করে। পলি উম্রিগড়, মনসুর আলি পতৌদি এবং গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ সন্তুষ্ট থেকেছেন একটিতেই।

ভারতের পক্ষে প্রথম ডবল সেঞ্চুরিটি আসে পলি উম্রিগড়ের ব্যাট থেকে। ১৯৫৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে উম্রিগড় করেছিলেন ২২৩ রান। ওই সিরিজেই অবশ্য ভিনু মাঁকড় বোম্বাই এবং মাদরাজে যথাক্রমে ২২৩ এবং ২৩১ রান করেন। এর মধ্যে মাদরাজে পঞ্চম টেস্টে পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে গড়া প্রথম উইকেটে ৪১৩ রানের বিশ্বরেকর্ডটি আজও অম্লান। মাঁকড়ের ওই ২৩১ রানের ইনিংসটি এখনও পর্যন্ত ভারতীয়দের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত। নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে চতুর্থ ডবল সেঞ্চুরিটি (২০০ নট আউট) দিলীপ

অংশুমান

সারদেশাইয়ের, ১৯৬৫ সালে বোম্বাইতে।

শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের তিনটি ডবল সেঞ্চুরির মধ্যে সুনীল গাওসকরের একারই দুটি। ১৯৭১ এবং '৭৮ সালে যথাক্রমে পোর্ট অব স্পেন এবং বোম্বাইতে গাওসকর করেন ২২০ এবং ২০৫ রান। তৃতীয় ডবল সেঞ্চুরিটি (২১২) সারদেশাইয়ের, ১৯৭১ সালে কিংসটনে। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও ভারতের দ্বি-শত রানের ইনিংস রয়েছে মাত্র তিনটি। ১৯৬৪ সালে দিল্লিতে মনসুর আলির অপরাজিত ২০৩, ১৯৭৯ সালে ওভালে গাওসকরের ২২১ এবং ১৯৮১-৮২ সিরিজে মাদরাজে বিশ্বনাথের ২২২। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের কোনো ডবল সেঞ্চুরি নেই।

ডবল সেঞ্চুরি প্রসঙ্গে একটা আশ্চর্য খবর তোমাদের জানিয়ে দিই—এ পর্যন্ত যাঁরা ভারতের পক্ষে দ্বি-শতাধিক রানের ইনিংস গড়েছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র মাঁকড় ছাড়া আর কেউই কিন্তু সেই টেস্টে ভারতকে ড্রয়ের বেশি কিছু উপহার দিতে পারেননি। ভারত শুধু সেই দুটি টেস্টেই 'জয়' পেয়েছে যে দুটিতে ভিনু মাঁকড় ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন।

দ্বিতীয় টেস্টও পণ্ড

মণীশ মৌলিক

বাঙ্গালোরের টেস্ট ম্যাচ পণ্ড করেছিল বৃষ্টি। জলন্ধরেও বৃষ্টিই মানুষকে নির্বিঘ্ন ক্রিকেটের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করল। টেস্ট-ক্রিকেট জলন্ধরে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল। হাজার-হাজার মানুষের আশাকে ভাসিয়ে দিলেন বরুণদেব। ফলে, বাঙ্গালোরের মতো, জলন্ধরেও অমীমাংসিতভাবে শেষ হল দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ।

নব-নির্মিত গান্ধি স্টেডিয়ামে টসে জিতে ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব পাকিস্তানকে ব্যাট করতে দেন। পিচে যতটুকু ঘাস ছিল তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রথম দুই ওভারে দুটি উইকেট নিয়ে কপিল পাকিস্তানিদের বিপাকে ফেলে দিয়েছিলেন। টেস্টের প্রথম বলে মহসিন খানকে আউট করে কপিলদেব রেকর্ড করেছেন। কোনো টেস্ট-কেন্দ্রের উদ্বোধনী খেলায় এমন কৃতিত্ব কারও নেই। হানিফ মহম্মদের ছেলে শোয়েব মহম্মদ জলন্ধরে টেস্ট-ক্রিকেটে অভিষিক্ত হলেন। কিন্তু উল্লসিত হওয়ার মতো কিছু করতে পারেননি তিনি। আর এক নবাগত কাসিম উমেরও আশাপ্রদ রান করতে পারেননি। দুঃসময়ে কিছুটা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন জাহির আব্বাস। কিন্তু দলকে বিপন্মুক্ত করার আগেই তিনি প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। ভাল ইনিংস খেলার আগে জাভেদ মিয়াঁদাদ ও মুদাস্সর নজরকেও ফিরে যেতে হয়। অর্ধনমিত পাকিস্তান দুশো রানের আগে মুড়িয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল। রুখে দাঁড়ালেন ন্যাটা-ব্যাটসম্যান ওয়াসিম হাসান রাজা। স্ট্রোকের বাহারে দর্শককে মুগ্ধ করেছেন তিনি। অনবদ্য একটি সেঞ্চুরির সাহায্যে দলকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।

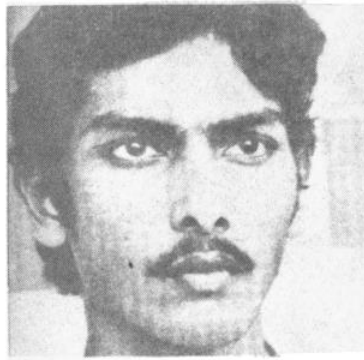

রাব শাস্ত্রী

জলন্ধরের মানুষ বহুদিন এই শতরানটির কথা মনে রাখবে।

পাকিস্তানের ৩৩৭ রানের জবাবে ব্যাট করতে এসে ভারত প্রথমে বিপাকে পড়ে। পাঁচ রানের মাথায় গাওসকর আউট। হাফিজের বলে বোল্ড। কুড়ি রানের মাথায় অমরনাথ বিদায় নেন। নড়বড়ে যশপালকে ফিরিয়ে দেন তাহির নাক্কাশ। শাস্ত্রীর বিরক্তিকর ব্যাটিং অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়েছে। পাটিল ও শাস্ত্রী 'জীবন' পেয়েও যেভাবে ব্যাটিং করেছেন তাতে কখনও মনে হয়নি ভারত এ-টেস্টে ফয়সলা চায়। গায়কোয়াড় ডবল সেঞ্চুরি করেছেন। বলা বাহুল্য, বিপদকালে তা দলকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। এই ২০১ রানের ইনিংস ছিল একঘেয়েমি ও বিরক্তিতে ভরা। ঈশ্বরের করুণা না পেলে চারটি সহজ ক্যাচ তুলেও দুশো রান করা যায় না। গায়কোয়াড়ের দ্বিশতাধিক রান স্কোর বোর্ডের শোভা বাড়াবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যাঁরা এই ইনিংসটির সাক্ষী রইলেন তাঁদের স্মৃতি সুখের হবে না।

মোট ৩৭৪ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পরে, হাতে অল্পই সময় ছিল। সে-সময়ে যা হয়েছে তাকে প্রহসন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

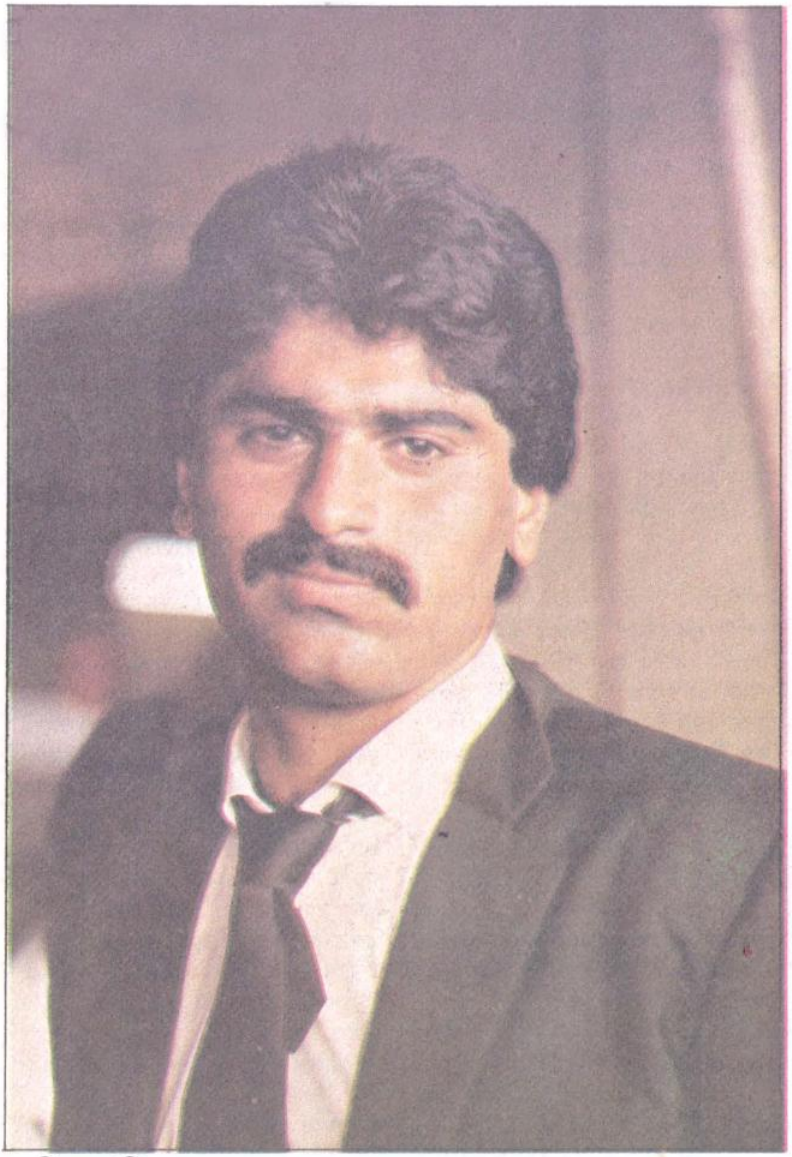

আজিজ হাফিজ

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

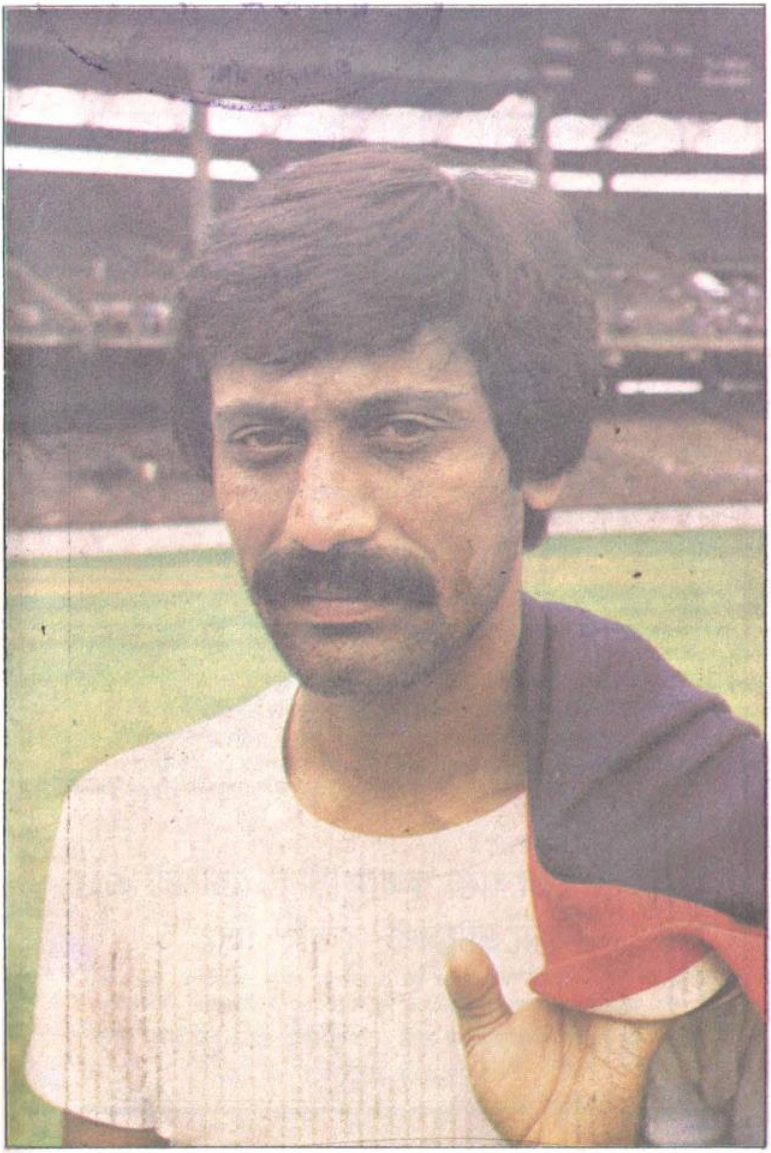

ওয়াসিম রাজা (জলন্ধরে সেঞ্চুরি) ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

আকর্ষণীয় রচনা প্রতিযোগিতা

ভেরোনা টিফিন টোকন

আয়োজক

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

॥ ডুগডুগি ॥

☐ **রচনার বিষয়বস্তু : নেতাজীর জীবনের যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা (এক হাজার শব্দের মধ্যে)**

☐ কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যোগ দিতে পারবে।

☐ প্রবেশ পত্রের জন্য পঞ্চাশ পয়সা ডাকটিকিট সহ ডুগডুগির সম্পাদকীয় দফতরে আবেদন করতে হবে (সম্পাদিকা-ডুগডুগি/ ডাক হলদিয়া টাউনশিপ/ জেঃ- মেদিনীপুর/ পশ্চিমবঙ্গ/ পিন-৭২১৬০৭) ফোন-৩৪৬৮ (হলদিয়া)

☐ প্রবেশ পত্র ছাড়া কোন রচনা গ্রহণ করা হবে না। রচনা জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৩

উদ্যোক্তা ঃ

ভেরোনা কমার্শিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ

রেজিঃ অফিস দুর্গাচক (হলদিয়া) পিঃ ৭২১৬০২ জেলা মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
হেড অফিস ৭১/১এ, পটুয়াতোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ টেলিফোন : ৩৪-২৩৩৬

আপনার প্রিয় শিশুর প্রিয় সঙ্গী 'ডুগডুগি'র প্রতি সংখ্যায় থাকছে 'ভেরোনা প্রশ্নমালা'।

ফুটবলে অনিশ্চয়তা

সুব্রত সিংহ

প্রি-অলিম্পিক ফুটবলের এশিয়া অঞ্চলের তিন নম্বর গ্রুপের প্রথম পর্যায়ের প্রথম খেলায় ভারত ১—২ গোলে সৌদি আরবের কাছে হেরে যাওয়ায় ভারতের পক্ষে দ্বিতীয় পর্যায়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অবশ্য ভারতকে এখনও এই গ্রুপে সাতটি খেলা খেলতে হবে। সুতরাং ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ে যাওয়ার রাস্তা যে এখনই বন্ধ হয়ে গেছে, তা বলা যায় না। এই গ্রুপ থেকে প্রথম দুটি দেশ দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পাবে অন' চারটি গ্রুপের আটটি দলের সঙ্গে।

ভারত ও সৌদি আরব ছাড়া এই গ্রুপে আরও তিনটি দেশ আছে। তারা হল মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর। প্রতিটি দেশকেই প্রতিটি দেশের বিরুদ্ধে দুবার করে খেলতে হবে।

৬ নবেম্বর রিয়াদে এই সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ফিরতি খেলাটি খেলার আগে ভারত প্রথম দফায় ১৭ অক্টোবর সিঙ্গাপুর, ১৯ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়া ও ২২ অক্টোবর মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে। এই খেলাগুলি হবে সিঙ্গাপুরে।

এরপর কুয়ালালামপুরে দ্বিতীয় দফায় ভারত আবার খেলবে ২৫ অক্টোবর মালয়েশিয়া, ২৯ অক্টোবর সিঙ্গাপুর ও ৩১ অক্টোবর মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ পরের সবকটি খেলাই ভারতকে খেলতে হচ্ছে বাইরের দেশের মাটিতে।

তাই ভারতের সামনে নিজের দেশের মাটিতে সৌদি আরবকে হারিয়ে গ্রুপে সুবিধাজনক অবস্থায় যাওয়ার যে সুযোগ এসেছিল সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি।

অথচ খেলা শুরুর চার মিনিটের মধ্যেই গোল করে এগিয়ে গিয়ে ভারত জেতার যে প্রতিশ্রুতি রেখেছিল তা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেনি। আন্তর্জাতিক আসরে খেলার অনভিজ্ঞতাই ভারতের হারের প্রধান কারণ। কেননা সৌদি আরবের এই দলটি ভারতীয় দলের চাইতে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা আছে ভারতীয় দলে এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা তিন থেকে চার। আর সেই তুলনায় সৌদি আরবের এই দলটি বেশ কয়েক বছর ধরে ব্রাজিলের প্রখ্যাত খেলোয়াড় ও কোচ জাগালোর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে। এমনকী প্রি-অলিম্পিকের আগে এই দলটি ব্রাজিলে ও নিজেদের দেশে অন্তত চল্লিশটি ম্যাচ খেলেছে।

বল ট্র্যাপিং, গতি ও শারীরিক দিক থেকেও তাঁরা অনেক বেশি দক্ষ। তবে, ভারতীয় দল যেভাবে লড়াই চালিয়ে গেছে তা থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে পরবর্তী খেলাগুলিতে ভারত ভাল ফল করবে। দুটি দলের মধ্যে দলগত মানের খুব একটা ফারাকও নেই।

প্রথম খেলাতে হেরে গিয়ে তাই দমে যাবার মতো কারণ নেই। আগেই বলেছি, ভারতের এখনও সাতটি খেলা বাকি। আর মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বা সিঙ্গাপুর কেউই ভারতের তুলনায় খুব একটা শক্তিশালী দল নয়। সুতরাং, ভারত যে প্রতিযোগিতার আসর থেকে ছিটকে গেছে তা বলা যায় না। অপেক্ষা করেই দেখা যাক না কেন, কী হয়! কথায় বলে না, "যার শেষ ভাল তার সব ভাল।"

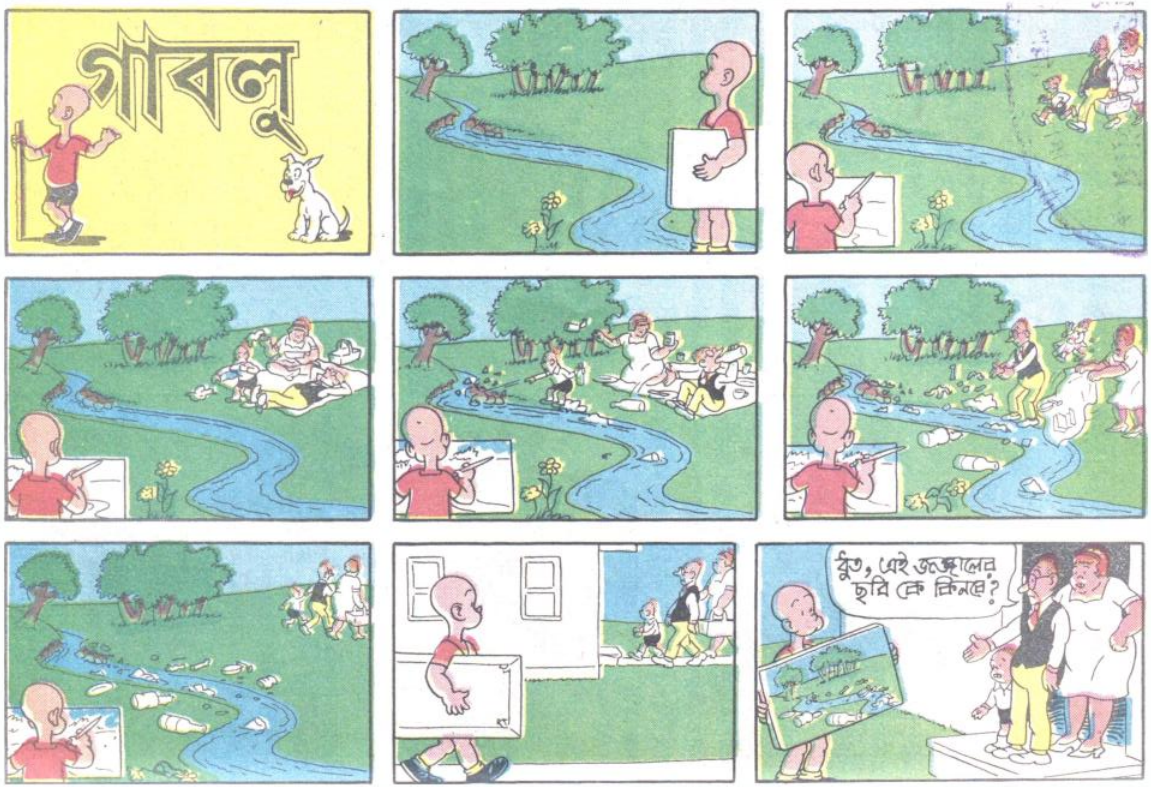
গাবলু
উঁহু, এই জঞ্জালের ছবি কে কিনবে?

গাবলু
আইস ক্রীম
?

এসেছে S-এর S-ময়

বাচস্পতি

"সামবাজারের সসীবাবু সকালবেলা সাতপয়সার সসা কিনে সাইকেলে চড়ে সোঁ সোঁ করে সসরীরে স্বর্গে চলে গেলেন—" এই মস্তবড় বাকাটা সব ইংরিজি S-এর মতো 'স' দিয়ে বললেন হিগিনকাকু। ভণ্টু আর বাবা হেসে উঠলেন। হিগিনকাকু তাদের পাত্তা না দিয়ে ঐ স-স করেই বললেন, "এবার স-এর সময় এসেছে ভাইসব! সব্বাই সান্ত হয়ে সোনো!"

বাবা বললেন, "দোহাই হিগিন, তুই আর বলিস না। আজকাল সক্কলে দেখি স-স করে কথা বলছে। ইশকুল-কলেজে রাস্তাঘাটে যেখানেই ছেলেমেয়েদের কথা শুনি, সবাই ঐ এক স—ঐ দন্ত্য-স দিয়ে কথা বলছে। অবাক কাণ্ড!"

ভণ্টু চেঁচিয়ে বলল, "এ কী বাবা, তুমি আবার ভুল করলে। ওটা দন্ত্য-স নয়, দন্তমূলীয় স। তাই না কাকু!"

"যুগ-যুগ জীয়ো, যুগ-যুগ জীয়ো।" বলে ভণ্টুকে মুষ্টিবদ্ধ হাতে অভিনন্দন জানালেন হিগিনকাকু। বাবা জিভ কেটে বললেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, দন্তমূলীয় স। কিন্তু হিগিন, তোর কি মনে হয় না যে মেদিনীপুর থেকে দন্তমূলীয় স-এর বাহিনী এসে তালব্য শ-দের দলে দলে আক্রমণ করছে, আর তালব্য শ-রা হেরে ভূত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে? আমার তো মনে হয় বাংলায় তালব্য-শ-দের দিন শেষ হয়ে এল।"

হিগিনকাকু জবাব না দিয়ে আবার আবৃত্তি করলেন, "খুব যে শাইকেলে বসে শিগারেট খাওয়া হচ্ছে! গিয়েছিলে কোথায়? 'শিনেমা দেখতে।' 'কী শিনেমা?' 'শ্যামশন অ্যাণ্ড ডিলাইলা'।"

বাবা হেসে ফেললেন, "দাঁড়া, দাঁড়া! এ-রকম কেউ বলে না কি? আমরা তো জানতাম কেবল স-এর দোষ আছে লোকের। শ-এর জায়গায় স বলা। তা স-এর জায়গায় শ-ও বলে নাকি?"

"খুব বলে, হাওড়া-হুগলি-বর্ধমানের বহু অঞ্চলে। কত শ্যাম্পেল চাও। শেমি-ফাইন্যালে রেলওয়ে এফ-শি আজ একটা শেমশাইড গোল খেয়েছে জানো? আমি বাশে করে শাউথের দিকে যাচ্ছিলাম। অ্যাকশিডেন্ট হতে হতে ড্রাইভাব শেভ করে দিল,শিট থেকে ছিটকে গেলাম। রেলওয়ে এফ-শির এক শাপোর্টার নাকি শুইশাইড করতে সামনে লাফিয়ে পড়েছিল। টাটা শেন্টারের সামনে তার শুটকেশটা এখনো পড়ে আছে। বড্ড শ্যাড ব্যাপরটা। ক্লাবের শেক্রেটারি আর ভাইশ-প্রেশিডেন্ট লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।"

"বাপ্ রে বাপ্ রে বাপ্, তুই থাম্ হিগিন। শ-এর জায়গায় স, আর স-এর জায়গায় শ—এ তো মহামুশকিল হল। কী করা যায় বল্ তো!"

ভণ্টু বলল, "বাংলা লেখায় তো তিনটে 'শ' আছে কাকু—ঐ তালব্য-শ, আর সবাই যাকে বলে দন্ত্য-স, আর মূর্ধন্য-ষ! আমাদের উচ্চারণেও কি তাই আছে? ঐ তিনটে শ-ই?"

"উচ্চারণে তো আছে। কিন্তু কে কোতায় কীভাবে আছে সেই হল গিয়ে কতা, বুইলি বাপ? সেইটে শোন্ তবে," বলে হিগিনকাকু ভুঁড়িতে হাত দিয়ে হঠাৎ থমকে গেলেন। বললেন, "একটু যেন খিদের আওয়াজ পাচ্ছি!" (ক্রমশ)

মিলির প্রশ্ন

প্রসাদ

হঠাৎ মিলি বাবাকে এক প্রশ্ন করে বসল।

"Daddy," Milly asked, "do we need poets?"

Before Mr Roy could answer the question, Chambal broke in.

"No," he said, "we need scientists, not poets."

But Mr Roy wasn't prepared to accept such a hasty judgment.

"Why did you ask that question, Milly?" Mr Roy said.

"I'm going to write an article for the school magazine. Our English mistress suggested the title 'Do we need poets?'"

কাজেই, কথাবার্তা চলতে লাগল। চম্বল বলে, কবিতার কী দরকার ? চামেলি বলে, পড়তে ভাল লাগে, ব্যস্।

Mr Roy said, "Need we go any further, Chambal? Milly says she likes poetry. Would it be right to deny her something she enjoys? You'd need to have a very good reason for doing that."

Mrs Roy said, "You needn't suppose that Chambal doesn't like poetry too."

Mr Roy said, "He need not like all kinds of poetry. There must be some poetry you too like, Chambal."

"Well, yes." Chambal had to admit, "Some poems do sound good to the ear. That's the kind I like."

Mr Roy said, "You need read no other kind. No one need read poetry that he doesn't like."

Chambal grumbled, "We have to, at school, whether we like it or not."

এবারে বিশেষভাবে লক্ষ করো এই শব্দটি কী রকম ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে

NEED

প্রথমে দ্যাখো

We need scientists.
Do we need poets?

তারপর দ্যাখো, নীচের বাক্যেও শব্দটি একই থাকছে, তার সঙ্গে 'এস্' যুক্ত হচ্ছে না

He need not like all kinds of poetry.

কিন্তু

Milly needs help.
She needs help from others.

লক্ষ করো প্রথম দুটি এবং শেষ দুটি বাক্যে শব্দটির ব্যবহার একরকম, আর তৃতীয় বাক্যটিতে অন্যরকম, যেমন ধরো, নীচের বাক্যগুলি

Why did you need to ask the question?
Need we go any further?
You need have no hesitation.
You need read no other kind.
No one need read poetry that he doesn't like.

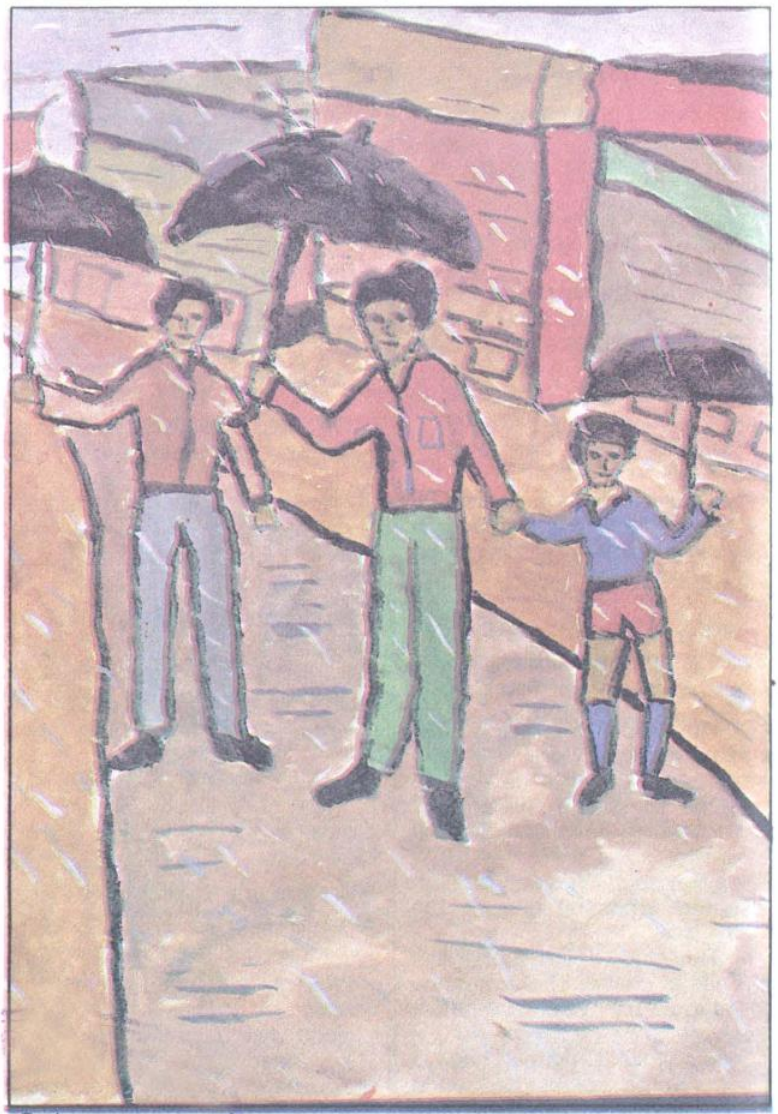

ছবি এঁকেছে **শুভব্রত কর্মকার** (বয়স ১১)

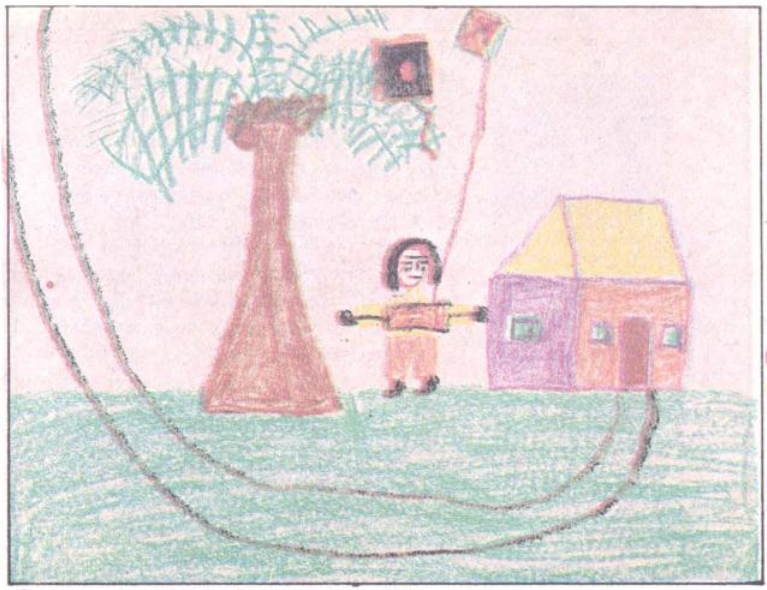

ছবি এঁকেছে **আনন্দরূপ চট্টোপাধ্যায়** (বয়স ৮)

ছবি এঁকেছে **অসীমা চৌধুরী** (বয়স ৯)

পার্থসারথি চক্রবর্তীর
বই মানেই মজার বিজ্ঞান,
বিজ্ঞানের মজা

বিজ্ঞানের রহস্যের প্রতি কিশোর-মনকে আকৃষ্ট করার মতো নির্ভরযোগ্য বই বাংলা ভাষায় খুব কমই প্রকাশিত হয়। পার্থসারথি চক্রবর্তী শুধু যে সেই অভাবই পূরণ করে চলেছেন তাই নয়, বিষয়কে সরস এবং মজাদার, কৌতূহলকর এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হয় কোন্ জাদুতে, তাও তাঁর অজানা নয়। গল্পচ্ছলে তিনি শেখান বিজ্ঞানের নানান গভীর তত্ত্ব ও বিজ্ঞান নিয়ে হরেক মজার খেলা, শোনান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্পকাহিনী, বুদ্ধিকে শান দেবার জন্য দারুণ-দারুণ মজা দেন উপহার। তাঁর বই বেরুতে-ই তাই আলোড়ন পড়ে যায় কিশোরমহলে।

পার্থসারথি চক্রবর্তীর বই

কেমিক্যাল ম্যাজিক ৬·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৬·০০
রসায়নের ভেলকি ৪·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০
তত সহজ ছিল না ৬·০০
মজার এক্সপেরিমেণ্ট ৫·০০
বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা ৬·০০
পদার্থবিজ্ঞানের খোশখবর ৭·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

মাছ-চোর

আমাদের বাড়ির পাশে একটা পুকুর ছিল। সেই পুকুরটাতে অনেক ছোট-বড় মাছ ছিল। প্রতি সপ্তাহে সেই পুকুর থেকে যে মাছ ধরা হত সেই মাছ আমাদের গ্রামের লোকেরাই কিনত। বাজারের তুলনায় দামটা শস্তা এবং জ্যান্ত মাছ।

মাছের লোভে মাছ-চোরেরা হানা দিতে লাগল পুকুরে। রাতের অন্ধকারে জাল দিয়ে ধরে চোরেরা পুকুরের তিন ভাগ মাছ শেষ করে দিল।

চোরের উৎপাতে গ্রামের লোক দিশাহারা। রাত জেগে অনেকে পাহারাও দিতে লাগল, কিন্তু মাছ চুরি বন্ধ হল না। পুকুরে আর মাছ নেই বললেই চলে।

সেদিন রবিবার। রাত কত হবে জানি না। হঠাৎ কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের বাড়ির ছোট্ট টমির ডাক।

টমির ডাকে আমাদের বাড়ির সবারই ঘুম ভেঙে গেল। এমনভাবে টমি তো কোনোদিন চিৎকার করে না! ব্যাপার কী? বাবা লাঠি নিয়ে উঠলেন। আমিও বাবার পেছন-পেছন গেলাম। কিন্তু এ কী! পুকুরের পাড়ে আসতেই আবছা জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলাম টমি কাকে যেন কামড়ে ধরেছে। টমির চিৎকারে পাড়ার লোক জেগে গিয়েছিল। সবাই এল পুকুরধারে।

বাবা টর্চের আলো ফেললেন চোরের মুখে। কিন্তু এ কী! টমি যাকে কামড়ে ধরেছে সে হল আমাদের পাড়ার রামু। পাড়ার লোকরা পুকুর পাহারা দেবার জন্য তাকে রেখেছিল।

মাছ-চোর অবশেষে ধরা পড়ল। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল টমিকে। টমি রোজ রাতে পুকুরধারে ঘোরে। এর পর কোনোদিন পুকুর থেকে আর মাছ চুরি হয়নি।

পূর্ণিমা দে (বয়স ৭)

তরু নামে গোরু

এক যে ছিল গোরু
নাম ছিল তার তরু
পাগুলো তার সরু
এক যে ছিল গরু
খেত সে মাঠে ঘাস
করত সে ফোঁসফাস

সৌমেন দেবনাথ (বয়স ১৪)

মেজদার বন্ধু

মেজদার বন্ধু শ্রীশঙ্কর সেন,
সারাদিনে কাপ-কুড়ি চা পান করেন।
বহুকাল ধরে ভাত খান না তিনি,
সাতখানা রুটি খান, সঙ্গে চিনি।
মাছ ডিম মাংসও না পেলে চলে,
তবে খুব খুশি হন চিকেন পেলে।
এত কম খান তবু স্বাস্থ্যটি খাসা,
জাহাজে করেন কাজ, শিবপুরে বাসা।

সুচরিতা বিশ্বাস (বয়স ৯)

মনে রেখো

হোম-টাস্ক না হলে
দেব কষে কান মলে
হয় যদি বানান ভুল
টান দেব ধরে চুল
হাতের লেখা চাই চাই
না হলে খাওয়া নাই
মনে রেখো সব সময়
টি ভি দেখা ভাল নয়

অদিতি দাস (বয়স ৯)

বাঘা

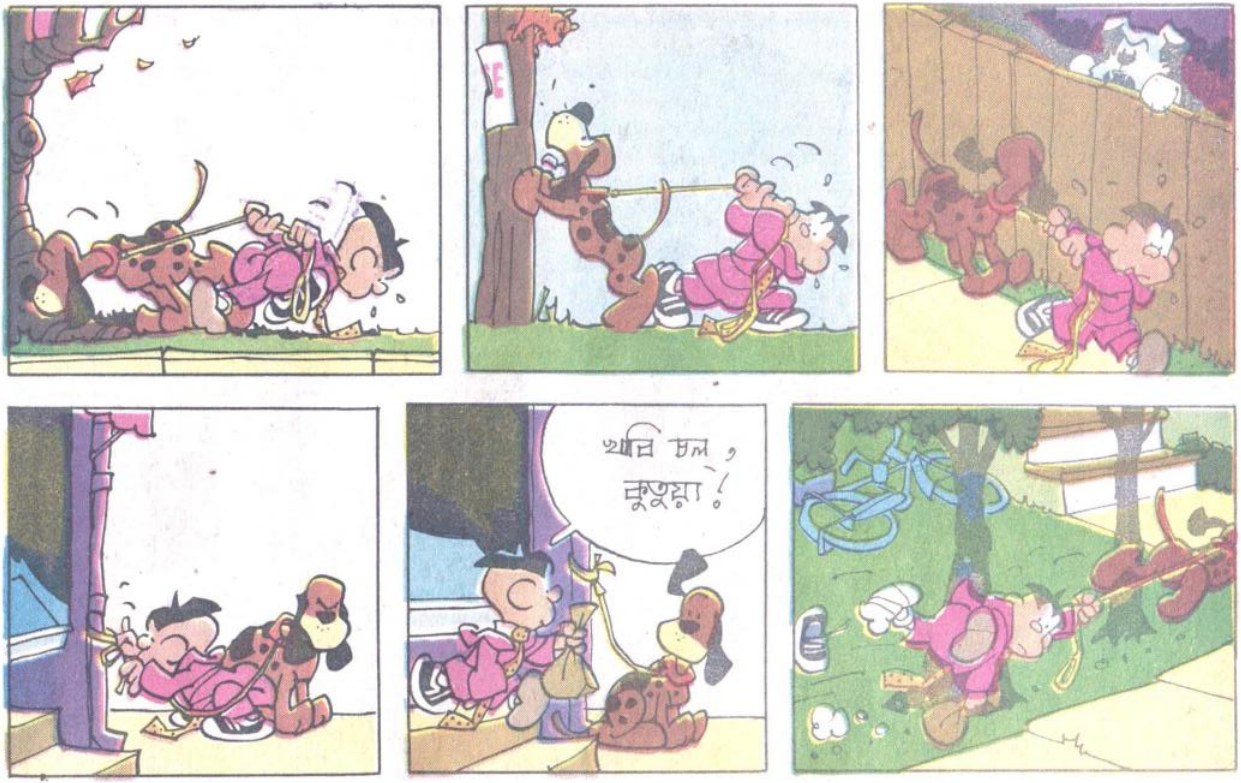

বাঘা

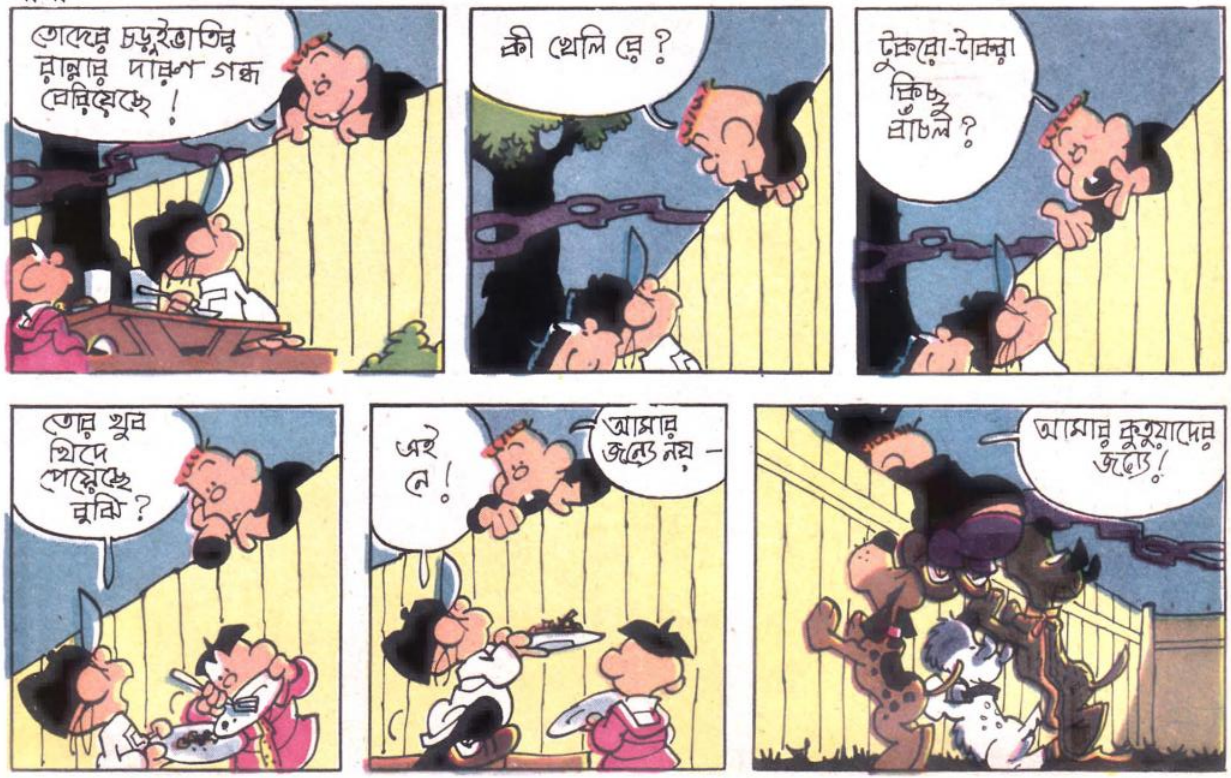
তাদের চড়ুইভাতির রান্নার দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে!
কী খেলি রে?
টুকরো-টাকরা কিছু বাঁচল?
তোর খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?
এই নে!
আমার জন্যে নয় –
আমার কুকুরাদের জন্যে!

হাজার হাজার গৃহিণীরা যা মানে...
স্বস্তিক পপুলার সম্পর্কে অমিতা-ও তাই জানে...

"হ্যাঁ, সাশ্রয় আমি চাইতাম বটে, তবে সঙ্গে কোয়ালিটিও। আর স্বস্তিক পপুলার একদম তাই। এর দাম অন্যান্য নামকরা ডিটারজেন্ট পাউডারের চেয়ে কতো কম অথচ কাচা হয় কি দারুণ!"

নীল রঙের স্বস্তিক পপুলার নানান গুণে ভরপুর এক চমৎকার পাউডার:

- এটি স্প্রে-ড্রায়েড হওয়ার দরুন জলেতে চটপট গুলে যায়।
- এতে অপ্টিক্যাল হোয়াইটেনার মেলানো থাকার দরুন কাপড় বেশী পরিষ্কার ও ধবধবে চমৎকার ধোয়।
- এতে জল মিঠে বানানোর এক বিশেষ উপাদান থাকার দরুন খরা জলেও ধোয়া খুবই সহজ।
- এটি স্বস্তিক-এর রিসার্চ দ্বারা তৈরী এক উৎপাদন হওয়ায় দরুন অন্যান্য নামকরা ডিটারজেন্ট পাউডারের চেয়ে দামে কতো কম অথচ ধোয় কি দারুণ।
- ২.৫ কিলো, ১ কিলো আর ৫০০ গ্রামের পলিপ্যাকে পাবেন।

স্বস্তিক

পপুলার

ডিটারজেন্ট পাউডার

সবচেয়ে কম দাম অথচ কাজে কতো সুনাম

১ কিলো কেবল ১০ টাকা
স্থানীয় কর আলাদা

Shilpi DM 17/83 Ben

Regd. No. WBCC 251. MH—BY-SOUTH 683. ANANDAMELA 16 November 1983

জীবন ও হনু আগামী দিনের প্রতীক্ষা করছে

যখন যোগাযোগ হবে সহজতর

১৯৮৮ সালের পরে গ্লাস ফাইবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আলোবিবর্ধন যন্ত্রের (লেসার) স্পন্দন ব্যবহার করে আটলান্টিকের ওপারেও ফোন করা সম্ভব হবে।

বৈদ্যুতিক বা বেতার তরঙ্গের চেয়ে লেসার অধিকতর তথ্য নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুত গ্লাস ফাইবারগুলি প্রতি সেকেণ্ডে ৫৬০০০০০০ 'খণ্ড' সংবাদ বহন করবে : ফলে একই সঙ্গে ৪০০০০ টি ক্ষেত্রে ফোনে কথোপকথন সম্ভব হবে !

সেইভাবে ১০ কোটি টি ভি চ্যানেলের মারফৎ বেতার তরঙ্গের পরিবর্তে দৃশ্যমান আলোক ব্যবহার করে একই সঙ্গে ছবিও পাঠানো সম্ভব হবে। ছবি প্রক্ষিপ্ত করার জন্যও টি ভি রিসিভারের মধ্যে লেসার ব্যবহার করা চলে

একটি লেসার 'গান' (gun) একটি প্রিজম্-এর (ত্রিপার্শ্ববর্তী কাঁচ) মধ্যে দিয়ে অতি তীব্র সাদা আলোক বিকীরণ করে। আলোক রশ্মি তিনটি রঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় : লাল, নীল ও সবুজ। অন্য একটি প্রিজম-এই রংগুলিকে মিশিয়ে দিয়ে বিশেষ রঙের মিশ্রণের একটি

সূক্ষ্ম রশ্মিতে পরিণত করে, 'যেটি প্রকৃতপক্ষে প্রতি সেকেণ্ডে হাজার বার পরিবর্তিত হয় !

এই সূক্ষ্ম রশ্মি পর্দার ওপরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলাফেরা করে, যার ফলে সমস্ত প্রতিমূর্তিটি 'চিত্রিত' হতে থাকে। এই দ্রুত গতির জন্যই সমস্ত পর্দাটি একটানা আলোকিত হয়ে আছে বলে মনে হয়···যেখানে ফুটে ওঠে সুন্দর স্বচ্ছ প্রতিমূর্তি।

লেসার এমনই সর্বার্থসাধক যে চুরুহ চোখের অস্ত্রোপচারের কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সৈন্যবাহিনীতেও লেসার একটি যথার্থ ও শক্তিশালী অস্ত্ররূপে গন্য করা হয়। বৃহৎ শিল্পে লেসারকে ধাতব দ্রব্য-কাটার কাজে ব্যবহার করা হয়। মাথনের মধ্যে দিয়ে যেমন সহজে ছুরি চালানো যায়, একটি লেসার রশ্মিও তেমনি অবলীলাক্রমে ইস্পাতের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে !

ভবিষ্যতে একটি ব্যক্তিগত বহনযোগ্য ট্রানজিস্টার মারফৎ পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হবে। শত শত পৃথিবী প্রদক্ষিণরত উপগ্রহের মারফৎ একটি অন্য যে কোনো ট্রানজিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে। প্রত্যেক দেশ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তির পরিচয় নির্দেশক সংখ্যা থাকবে। এক এই লক্ষ লক্ষ সংখ্যাগুলি নখের আকারের যন্ত্রগণকে সঞ্চিত করে রাখা হবে—যেটি ডাইরেক্টরীর কাজ করবে।

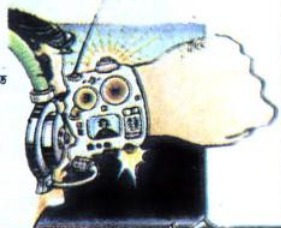

জীবনবীমা হ'ল আপনার ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত রাখার নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত উপায়। এ সম্পর্কে বিশদ জেনে নিন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

1983 WORLD COMMUNICATIONS YEAR

daCunha/LIC/144/83 BN.